ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়, বৈশিষ্ট্য এবং সুরবৈচিত্র্য

লুৎফর মুর্শেদ চৌধুরী (রাজিব)
এম. ফিল. গবেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মে ২০১৯

ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়, বৈশিষ্ট্য এবং সুরবৈচিত্র্য

গবেষক

লুৎফর মুর্শেদ চৌধুরী (রাজিব)

রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ২৪১

শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩ইং

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে ‘ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়, বৈশিষ্ট্য এবং সুরবৈচিত্র্য’ শীর্ষক বিষয়ের উপর অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি।

লুৎফর মুর্শেদ চৌধুরী (রাজিব)
এম. ফিল. রেজি নং: ২৪১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-১৩ ইং
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, লুৎফর মুর্শেদ চৌধুরী (রাজিব) কর্তৃক উপস্থাপিত 'ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়, বৈশিষ্ট্য এবং সুরবৈচিত্র্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ ২৪১, ২০১২-২০১৩। এটি লেখকের মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেননি।

(ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের সংগীতের নিজস্ব ঐতিহ্য এ দেশের লোকসংগীত। লোকসংগীত লোক মানুষের সহজ-সরল মনের প্রকাশ, যেখানে আছে মাটি ও মানুষের প্রাণের ছোঁয়া। সমগ্র বাংলাদেশের অঞ্চল বিভাজনের প্রেক্ষিতে এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ময়মনসিংহ অঞ্চল হলো সমৃদ্ধতম লোকসংগীতাঞ্চল। আর এ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়, বৈশিষ্ট্য এবং সুরবৈচিত্র্যের রহস্যের উপলব্ধিই বর্তমান গবেষণা কর্মটির মূল প্রেরণা।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সংগীত বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীর প্রতি, যাঁর পরিকল্পনা এবং দিকনির্দেশনায় গবেষণাকার্যটি শুরু করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক সংগীত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী - এর অকৃত্রিম সহযোগীতা এবং নিরন্তর উৎসাহ আমার পাথেয়। তাঁকে জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

অভিসন্দর্ভটি রচনা কালে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ এনামুল হক এবং সরকারি সংগীত কলেজের প্রভাষক তিলোত্তমা সেনকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য গ্রন্থের উৎস হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্রন্থাগার এবং ময়মনসিংহের মুসলিম ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কম্পিউটার মুদ্রনের কাজে সহযোগিতার জন্য নূর হোসেনকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণাকর্ম রচনাকালে আমার ছোট বোন এর সহযোগিতার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। যাদের অনুপ্রেরণায় আমার এই পথ চলা তাঁরা হলেন আমার পিতা-মাতা। তাঁদের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

লুৎফর মুর্শেদ চৌধুরী (রাজিব)

সূচি

ভূমিকা			৬
প্রথম অধ্যায়	:	ময়মনসিংহ অঞ্চল ও তার লোকসংগীত পরিচিতি	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়বৈচিত্র্য	২৬
তৃতীয় অধ্যায়	:	ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য	৩৫
চতুর্থ অধ্যায়	:	ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে আঞ্চলিক ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহার	৮৫
উপসংহার			১০৭
গ্রন্থপঞ্জি			১০৯

ভূমিকা

মূলত সংগীতের দ্বারাই পরিমাপ করা যায় কোন জাতি উৎকর্ষের কোন স্তরে আছে । অর্থাৎ সংগীতের উৎকর্ষ অপকর্ষই জাতির ও জাতীয়তার পরিচয়ের জন্য প্রামাণ্য। এ কথা সত্য যে, আমাদের সমৃদ্ধতম সংগীতভাণ্ডারের জন্য আমরা বাঙালিরা গর্বিত বটে। বাঙালি চিরদিনই সংগীতপ্রিয় জাতি, সংগীতের মধ্য দিয়েই বাঙালি মানসের সর্বাপেক্ষা সার্থক পরিচয় ফুটে ওঠে। বাংলা গানের ভিতর দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় যেমনটি ফুটে উঠেছে অন্যকোনো প্রকাশলীলায় তা সম্ভব হয়নি। বাংলা গানের তেমনি একটি সমৃদ্ধতম দিক হলো বাংলাদেশের লোকসংগীত।

বৈচিত্র্যময় লোকসংগীতে সমৃদ্ধ আমাদের এই বাংলাদেশ। এদেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোট-বড় নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি রয়েছে গানের স্রোত। কৃষিজীবী জনমানসের সংস্কারগত চিন্তা-ভবনা, বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসব অনুষ্ঠানে, জগৎ ও জীবন সম্পের্কে ঔৎসুক্য ও জিজ্ঞাসা, বাংলার নিসর্গ শোভা, নদী ও নৌকার রূপকাশ্রয়ী চিন্তা চেতনা, সমাজের অন্যায় অবিচার এবং অলৌকিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গ্রাম-বাংলার নিরক্ষর মানুষ গান বেঁধেছেন।

লোকমানুষের সংগীতই হলো 'লোকসংগীত'। সাধারণভাবে 'লোকসংগীত' বলতে জনশ্রুতিমূলক গানকে মনে করা হয়। অর্থাৎ যে গান মৌখিক ধারাকে অবলম্বন করে স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর করে বহমান থাকে তাকে লোকসংগীত বলে। এখানে 'লোক' অর্থে বোঝানো হয়েছে প্রাচীন ধারাশ্রয়ী কৃষিজীবী জনসমষ্টিকে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ। এই ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে বাংলা লোকসংগীত রচিত ও গীত হয়ে আসছে। কোন লোকসংগীত উৎপত্তির উৎসস্থল থেকে স্থানিক প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায় যে, এর মাঝে কোনো না কোনো ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকসংগীত সংস্কৃতিগতভাবে সীমিত নয়, আবার ভৌগোলিক দিক থেকে সীমাবদ্ধও নয়। এগুলি একটি ব্যক্তিমানুষের সৌন্দর্যপ্রতিভা হতে উৎপত্তি নেয়, বংশানুক্রমে হস্তান্তরিত হয় এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিবৃদ্ধি লাভ করে। লোকসংগীত যেহেতু প্রথমত ও প্রধানত নিরক্ষর লোকসমাজে লালিত হয় এবং সাধক কবি ও গায়ক-গায়িকাই লোকসংগীতের ঐতিহ্যকে বংশানুক্রমে সামনের দিকে নিয়ে যায়, সে কারণে লোকসংগীতের মধ্যে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পরিবেশের প্রভাব বিরাজ করে। মুখে মুখে গান রচনা করলেও লোকসংগীত রচয়িতার সামনে থাকে

Dhaka University Institutional Repository

আপন পারিপার্শ্বিক ভুবন। চতুঃপার্শ্বস্থিত নদ-নদী, খাল-বিল, মাঠ-ঘাট, বন-বনানী, উন্মুক্ত প্রান্তর, নীলাকাশ, জীব-জন্তু এবং ষঢ়ঋতুর বৈচিত্র্য। সংগীতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে এদেশের বিশেষ বিশেষ সংগীতের ভৌগোলিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে। আর এই অঞ্চলগুলোর সীমিত পরিসরেই এক বা একাধিক সংগীতের বিকাশ ঘটেছে। তাই সংগীতের অভ্যন্তরে বিধৃতভাবে চরিত্রচিত্রণে ঘটনার সংস্থানে, ঘটনার প্রকাশভঙ্গিতে এবং বিষয়বস্তুতে বিশেষ অঞ্চলে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষনীয়। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে বিভিন্ন এলাকার লোকসংগীত বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে অঞ্চলভেদে লোকসংগীতের গায়কী, ভাষা বৈচিত্র্য, বিষয়, বৈশিষ্ট্য এবং সুরবৈচিত্র্যের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

এ প্রেক্ষিতে অঞ্চল বিভাজনের দিক দিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীত অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন। কারণ ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আঞ্চলিক ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির প্রয়োগ, গ্রামের সাধারণ লোক কবিদের ভাটিয়ালি, জারি, সারি, পালাগান, ঘাটুগান সহ ইত্যাদি অনবদ্য সৃষ্টি ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতকে একটি সুসংহত অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। আর তাই ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়, বৈশিষ্ট্য ও সুরবৈচিত্র্যের রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা। কিন্তু এখনও ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের এ বিষয়গুলো সম্পর্কে একত্রে বিষদ আলোকপাত করা হয়নি। অতএব, ‘ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়, বৈশিষ্ট্য এবং সুরবৈচিত্র্য’ পর্যালোচনাই গবেষণার উদ্দেশ্য এবং অভিসন্দর্ভের বিষয়।

বিভিন্ন অধ্যায় ও পর্বে অভিসন্দর্ভটি যেভাবে বিন্যস্ত এবং সাজানো হয়েছে তা হলো ঃ

প্রথম অধ্যায়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, নামকরণ, জনবসতির পরিচয় সহ অঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং প্রচলিত লোকসংগীতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রধান ধারার লোকসংগীতগুলো আধেয় বিশ্লেষণ করে প্রতিটি লোকসংগীতের বিষয়বৈচত্র্য আলাদা ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে ব্যবহৃত সুর ও তালের বিশ্লেষণসহ স্বরলিপি উল্লেখ করে অত্র অঞ্চলের লোকসংগীতের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা, বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহার ও ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে গানের উদাহরণসহ তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য মূলত দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের লোকসংগীত এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থ, সম্পাদিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা হয়েছে।

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্রন্থাগার এবং ময়মনসিংহের মুসলিম ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল পুস্তকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীত সম্পর্কিত সকল তথ্য এবং লোকসংগীত এর বিষয়, বৈশিষ্ট্য, এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে অঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার নিবিড় পাঠের মাধ্যমে গবেষণার বিষয় আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ময়মনসিংহ অঞ্চল ও তার লোকসংগীত পরিচিতি

ময়মনসিংহ জেলা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের ময়মনসিংহ বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। লোকছড়ায় প্রচলিত রয়েছে যে, 'হাওড়-বাওড়-মইষের শিং এই তিনে মৈমনসিং' অর্থাৎ ময়মনসিংহ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলে রাজস্ব আদায়, প্রশাসনিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে স্থানীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য এই অঞ্চল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৭৮৭ সালের ১মে একটি জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চল স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিল- নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, পাহাড়-পর্বত, বনানী তথা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য আর ঐতিহাসিক স্মৃতি গৌরবগাথার জন্য।

ময়মনসিংহের মাটি ও মানুষের জীবনধারাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে পৌরাণিক নদ ব্রহ্মপুত্র । যার এক ভাগে রয়েছে পশ্চিমাঞ্চল। এক সময় তা পাটলীপুত্র ও পুণ্ড্রবর্ধনের অধীনে ছিল। আরেক ভাগে রয়েছে পূর্বাঞ্চল। যা ছিল কামরূপ প্রাগজ্যোতিষপুরের অধীনে। ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমানা দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা হয়ে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের আকার কালপরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে ময়মনসিংহ জেলা থেকে টাঙ্গাইল মহুকুমাকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র জেলায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮০ সালে আদি ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন মহুকুমা যথা জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণাকে পৃথক পৃথক জেলায় উন্নীত করা হয়। এছাড়া জামালপুরের অন্তর্গত শেরপুরকেও একটি পৃথক জেলায় উন্নীত করা হয়। এর আগে ব্রিটিশ আমলে ময়মনসিংহ জেলার কিছু কিছু অংশ সিলেট, ঢাকা, রংপুর ও পাবনা জেলার অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। এই ভাবে ময়মনসিংহ জেলা যা কিনা ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জেলা ছিল তার আকার ক্রমাগত সংকুচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান :

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশের উত্তরাংশে ময়মনসিংহ। এ জেলার উত্তরে গারো পাহাড় ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা। পশ্চিমে টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলা, দক্ষিণে গাজীপুর জেলা এবং পূর্বে কিশোরগঞ্জ জেলা অবস্থিত।

ময়মনসিংহের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমুদ্রগর্ভে ছিল নিমজ্জিত। ক্রমে পাহাড় পর্বত থেকে স্রোতবাহী পলি জমতে জমতে জেগে ওঠে চর। ময়মনসিংহ ক্রমে আবাসযোগ্য হতে থাকে। তবে ময়মনসিংহের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ টাঙ্গাইল ও জামালপুরের ভূমি গঠনে ব্রহ্মপুত্রের ভূমিকা প্রধান হলেও ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল গঠনে তেমন ভূমিকার কথা বলা যাবেনা। কারণ নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জে এখনও অনেক হাওড় বসবাসযোগ্য ভূমি গঠনের অন্তরায়। ব্রহ্মপুত্রের গতিপ্রকৃতি ও তার পলির বিস্তারের কথা মনে রেখে ময়মনসিংহ অঞ্চলকে পশ্চিম ও পূর্ব এই দুই অঞ্চলে ভাগ করা যায়। পশ্চিমাঞ্চলের টাঙ্গাইল ও জামালপুরের ভূমি গঠনের মতোই ব্রহ্মপুত্রের পলির প্রভাব রয়েছে মুক্তাগাছা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ সদরে, অবশ্য দক্ষিণাঞ্চল ভালুকা ও গফরগাঁও এই দুটি উপজেলার ভূমি গঠনেও পশ্চিমাঞ্চলের মতোই প্রভাব রয়েছে ব্রহ্মপুত্রের। আবার ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের ভূমি গঠনের মতো হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, ফুলপুর, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইলের ভূমি গঠন সম্পন্ন হয়েছে। তবে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের মতো এইসব উপজেলায় হাওর নেই। রয়েছে অনেক খাল-বিল। আর এ থেকেই বোঝা যায় ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলের ভূমি গঠন করার ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

ধারণা করা হয় মৌর্য আমলেই স্থলভাগ গড়ে উঠেছিল এবং সে সময় থেকেই ময়মনসিংহ অঞ্চলে জনবসতি স্থাপিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে সময়ে লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করেছিল বলেও অনেকে মত দিয়েছেন। ব্রহ্মপুত্র দ্বারা ভাগ হওয়া পূর্ব ময়মনসিংহ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশ ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত।

ময়মনসিংহের মধুপুর গড়ের পুরাতন পলল ভূমির কথা বাদ দিলে বর্তমান ময়মনসিংহের ভূ-অবয়বের গঠর হয়েছে পলল গঠিত সমভূমির মাধ্যমে। আর এই পলল গঠিত সমভূমি আবার দুই ধরনের। যেমন- এক. এই জেলার উত্তরে অবস্থিত গারো পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশে পললভূমি হচ্ছে 'পাদদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সমভূমি'। এই পাদদেশ সমভূমি গঠিত হয়েছে পাহাড়-পর্বত থেকে সৃষ্ট অভিকর্ষিক ও পলিমাটির মিশ্রণে। হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া হচ্ছে পাদদেশ সমভূমি অঞ্চল। দুই. 'সর্পিল প্লাবনভূমি' নামেও আরেক ধরনের পলল গঠিত সমভূমির যে নমুনা পাওয়া যায় তা ময়মনসিংহের নদ-নদীর অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রত্যক্ষ। নদ-নদী বাহিত পলল গঠিত চারণভূমি এবং তার পুনরায় ভাঙ্গন, বন্যার ফলে নতুন স্থানে পলল ভূমি গঠন এবং এলাকায় বারবার ভাঙ্গন-গড়নের ফলে সৃষ্ট প্লাবনভূমি সর্পিল আকৃতি ধারণ করে থাকে। সাধারণত এর উপরাংশে অধিক বালিকণা এবং জলাভূমির তলদেশের অধিক কর্দমকণা জমা হতে দেখা যায়। অবশ্য নদীর প্রশস্ততা, স্রোতের বেগ এবং বন্যার প্রকোপ ভেদে এসব এলাকায় মাটির বৈশিষ্ট্যের তারতম্য রয়েছে।

ভূ-অবয়বের গঠন কাঠামো ছাড়াও ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুযায়ী ময়মনসিংহ অঞ্চলের মাটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন- পাহাড়ি মাটি, লাল মাটি, পলি মাটি, দোআঁশ মাটি, এটেল মাটি।

এ অঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি উর্বরা মাধ্যম এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ নিম্নমানের কৃষি আবাদযোগ্য ভূমি। তবে ফল-ফলাদি জাতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য এই ভূমি অত্যন্ত উপযোগী। ব্রহ্মপ্রত্র-যমুনা অববাহিকায় পলিমাটি সমৃদ্ধ এলাকায় ভূমি উর্বরা এবং বহুবিধ ফসল জন্মানোর উপযোগী।

উপরোল্লিখিত উভয়বিধ অঞ্চল কৃষিকাজের জন্য বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট এলাকা হিসেবে পরিগণিত। এর কিছু অঞ্চল রয়েছে যা আদ্রতা রক্ষায় অধিকতর উপযোগী। তাই সারা বছর চাষের উপযোগী। এ অঞ্চলের অংশ বিশেষ জলসেচন ব্যবস্থাও সহজতর বলে অধিক চাষের উপযোগী । অবশ্য আরও কিছু জমি এখানে রয়েছে যা মোটামুটি ভাবে এ অঞ্চলের ফসল উৎপাদনের হারও বেশী।

ময়মনসিংহের নামকরণ :

ময়মনসিংহ অঞ্চলের নামকরণ নিয়ে রয়েছে নানা মত। কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহ অঞ্চলের নামকরণ নিয়ে লিখেছেন -

> "ময়মনসিংহ নামটী 'মমিনসাহী'র পরিবর্তিত সংস্করণ। কথিত আছে দিল্লীশ্বর আকবর সাহেবের সময়ে মমিনসাহ নামের কোন ব্যক্তি সরকার বাজুহার একাংশের অধীশ্বর ছিলেন। সেই মমিনসাহ হতেই তদীয় অধীকৃত মহালের নাম মমিনসাহী হয়েছিল।'আইন-ই আকবরই'-গ্রন্থে মমিনসাহী মহালের নাম দেখা যায। এই মমিন 'সাহী' শব্দই লিপি-বিড়ম্বনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিংহ রূপ ধারণ করে ক্রমে বর্তমানে একেবারে 'মৈমনসিংহ' এ পরিণত হয়েছে। মৈমনসিংহ বা ময়মনসিংহ রাজস্বে এ

Dhaka University Institutional Repository

> জেলার সর্ব্বপ্রধান পরগনা। পরগনা মমিনসাহী বা মৈমনসিংহের গভর্নমেন্ট রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলে এই জেলা ময়মনসিংহ নামে অভিহিত হয়েছে।"[১]

তবে কেদারনাথ মজুমদারের চাইতে আরো অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত অনেকেই যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেছেন। যেমন -

> "হোসেনশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর ছেলে নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের নামেই নসরতশাহী পরগনার নামকরণ হয় এবং তাঁর অন্যতম সেনাপতি মোমেনশাহের নামে মোমেনশাহী পরগনা নামকরণ হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে।"[২]

অন্য একটি জনশ্রুতি রয়েছে- মোঘল আমলে মোমেনশাহ নামে একজন সাধক ছিলেন, তার নামেই মধ্যযুগে অঞ্চলটির নাম হয় মোমেনশাহী। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার স্বধীন সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তার পুত্র সৈয়দ নাসির উদ্দিন নসরত শাহ'র জন্য এ অঞ্চলে একটি নতুন রাজ্য গঠন করেছিলেন, সেই থেকেই নসরতশাহী বা নাসিরাবাদ নামের সৃষ্টি।

অভিমত রয়েছে, ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৮৬ সালে রেল যোগাযোগ সৃষ্টির একটি ভুলের কারণে ময়মনসিংহ নামটি প্রতিষ্ঠা পায়। যে ভুলের কারণে নাসিরাবাদ থেকে ময়মনসিংহ নামটি প্রতিষ্ঠা পায় তা হল -

> "বিশ টিন কেরোসিন বুক করা হয়েছিল বর্জন লাল এন্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে নাসিরাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে। এই মাল চলে যায় রাজপুতানার নাসিরাবাদ রেল স্টেশনে। এ নিয়ে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পরবর্তীতে আরো কিছু বিভ্রান্তি ঘটায় রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরির্তন করে ময়মনসিংহ রাখা হয় (চিঠি নং ১২৯০ এম. তারিখ ১০.০৩.১৯০৫)। সেই থেকে নাসিরাবাদের পরিবর্তে ময়মনসিংহ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে নাসিরাবাদ নাম তলিয়ে গেছে অতীতের গহ্বরে। ১৮৬৯ সালে ১ এপ্রিল যখন পৌরসভা স্থাপিত হয় তখন এর নাম ছিল নাসিরাবাদ পৌরসভা কমিটি। ১৯০৫ সালে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটি হয়।"[৩]

তবে কোন কোন ইতিহাসবিদদের মতে মোঘল সেনাপতি মনমোহন সিংহ ঈশা খা কে দমন করতে যাওয়ার পথে এখানে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন এজন্য এখানকার নাম হয়ে যায় ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

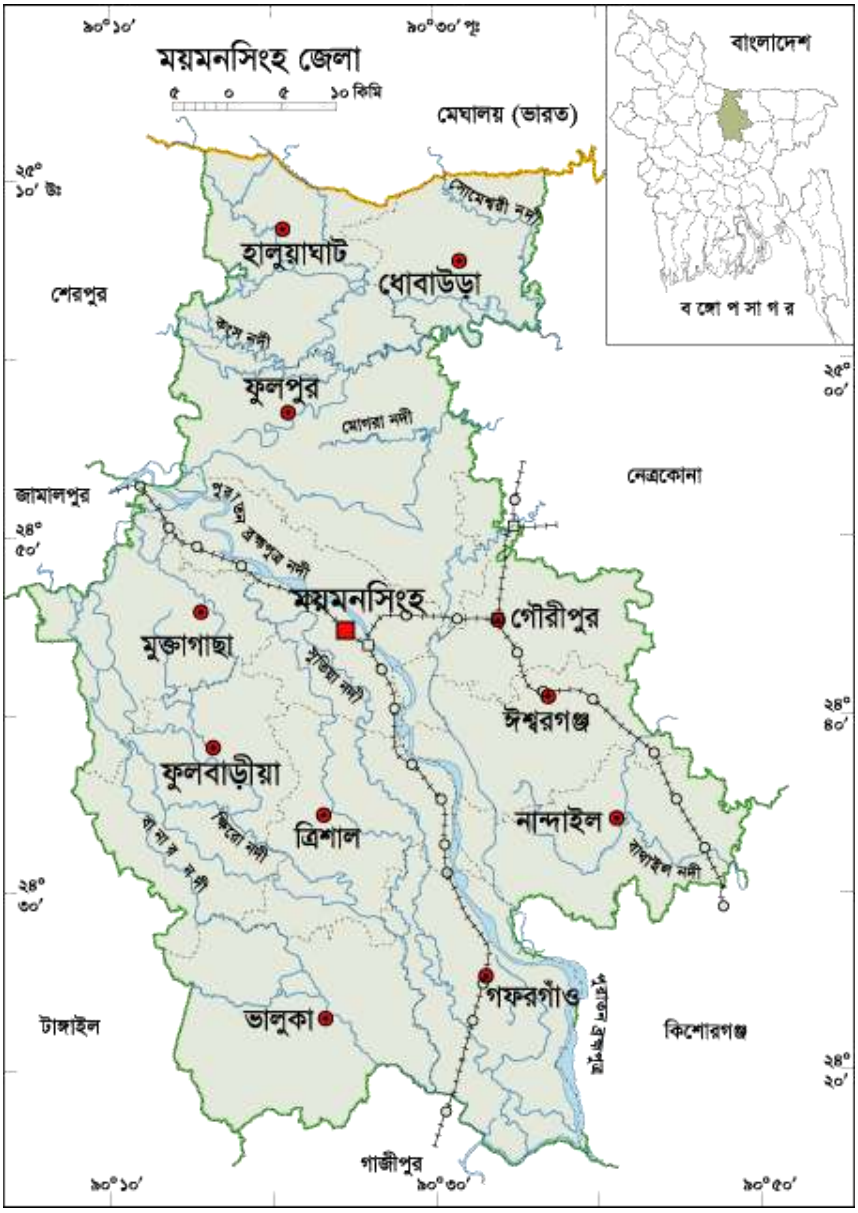

চিত্র : ময়মনসিংহ অঞ্চল

অন্তর্ভুক্ত উপজেলা :

ময়মনসিংহ অঞ্চল মোট **১৩** টি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত। এ গুলো হল:

ত্রিশাল, ঈশ্বরগঞ্জ, গফরগাঁও, গৌরীপুর, তারাকান্দা, ধোবাউড়া, নান্দাইল, ফুলপুর, ভালুকা, ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা এবং হালুয়াঘাট।

Dhaka University Institutional Repository

জনবসতির পরিচয় :

ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিশাল স্থলভাগের সামান্য অংশেই জনবসতি ছিল প্রাচীনকালে। এক্ষেত্রে মধুপুরের গড় উল্লেখযোগ্য। কেননা তখনও জনসংখ্যা তেমন হারে বৃদ্ধি পায় নি। তাছাড়া উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত ময়মনসিংহের বিশাল অঞ্চল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কালক্রমে এ অঞ্চলে দনীর পলি জমায় এবং বনাঞ্চল কেটে আবাসভূমি তৈরি হওয়ায় জনবসতি গড়ে ওঠে। জনবসতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি বৈচিত্র্যের প্রভাবে অধিবাসীদের জীবন চেতনার ও জীবিকার অন্বেষণে বিস্তার লাভ ঘটে। অবশ্য ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভূগঠনে ব্রহ্মপুত্রের অবদান অপরিসীম। এই অঞ্চলের বেলে, দোআঁশ, এঁটেল মাটির যে সংমিশ্রণ তাও লৌহিত্যের স্রোতধারার কল্যাণেই গড়ে ওঠেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রচুর পলিমাটিতে ময়মনসিংহের প্রাচীন ভূমি গঠিত। আর এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনও এসেছিল। গোলাম সামদানী কোরায়শীর মূল্যায়ন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য -

> "আর্যরা যে ভাষা ও ধর্মবোধ নিয়ে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিলো, তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে বেদ গ্রন্থাবলীতে। এরপর রাজ্যবিস্তার আর মেধা বিস্তারের তাড়নায় তারা যতই এগিয়ে গেছে, ততোই আদিম অধিবাসীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে তাদেরকে। জয়ী হয়েছে আর্যরাই, কিন্তু পরাজিত অনার্য জাতিগুলোর ঐতিহ্যকে তারা গ্রহণ না করে পারে নি। কিংবা পরাজিত অনার্য জনশক্তিই তাদের ঐতিহ্যসহ আর্য পরিমন্ডলে প্রবেশ করে বোধ ও মেধায় পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ফলে আর্য ধর্মবোধে উত্থান-পতন ও গ্রহণ-বর্জনের এক দীর্ঘ ইতিহাস সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সবকিছুর মধ্য দিয়ে আর্য ভাষার ব্যাপক বিস্তার রোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি। একমাত্র দ্রাবিড় ভাষাই এক্ষেত্রে সামান্য সফলতার পরিচয় দিয়ে এখনো দাক্ষিণাত্যে টিকে আছে। নতুবা এই উপমহাদেশের অনত্র আর্য ভাষারই জয় জয়কার। সুদূর সিন্ধু থেকে আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তার অপ্রতিহত গতি রুদ্ধ হয় নি। সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ ভাষাই আজ একমাত্র ভাষা। সেখানে অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর যারা এখনও টিকে আছে, তাদের প্রভাব নাই বললেই চলে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ অঞ্চলে আদিপর্বে অষ্ট্রো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর আধিক্য থাকলেও তারা ক্রমাগত আর্য প্রভাবের চাপে দূরে সরে গেছে, কিংবা নিজেরাই আর্য প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে বহিরাগতদের সাথে মিলে মিশে ব্রহ্মপুত্র তীরের জনসমাজ গড়ে তুলেছে।"[৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় সামাজিক আচার-আচরণ ছিল ধর্মনির্ভর। ধর্ম বলতে সনাতন ধর্ম থেকেই সৃষ্ট হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়কে বুঝাত। বাংলার স্বধীন সুলতানি শাসন আমলের পূর্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাধারণত কড়ি মুদ্রাই ব্যবহার হত। সে যুগে প্রাচীনকালের মুদ্রাই প্রচলন ছিল। পাল ও সেন রাজাদের নামাঙ্কিত কোনো মুদ্রা ছিল না।

প্রাচীন কালে কৃষিনির্ভর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গ্রামকে কেন্দ্র করেই। কৃষকের বাসস্থানও তাই গ্রামেই ছিল। সেহেতু বলা যায়, ময়মনসিংহ অঞ্চল বেশিরভাগই ছিল গ্রাম। গ্রামের মানুষের জীবন ছিল তখন নিস্তরঙ্গ। একটা বিষয় লক্ষনীয়, বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানি আমল প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়শ বছর আগ পর্যন্ত এ অঞ্চল মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের কেন্দ্রীয় শাসনের অধিকারে ছিল বটে কিন্তু একে ঔপনিবেশিক শানও বলা যাবে না। কেন্দ্রের শোষণকে, অত্যাচারকে মেনে নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে বারবার। মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেনদের শাসন এলাকার অন্তর্ভুক্ত এ অঞ্চল মগধ ও কামরূপের অঙ্গ ছিল।

অবশ্য সেন শাসনের সমসাময়িক কালে পূর্ব ময়মনসিংহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে ওঠে। ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করে কামরূপ জয়ের উদ্দেশ্যে আক্রমন করেছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদের বিশালতা ও দুর্গমতা তার অভিযানের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। তবে রাঙ্গামাটির দিক থেকে ইখতিয়ার উদ্দিন উজবেগ তুগ্রিল খাঁ পুনরায় ১২৫৮ সালে কামরূপ আক্রমন করলে কামরূপরাজ পলায়ন করেন। আর কামরূপ রাজ্য ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। পূর্ব ময়মনসিংহের সুসঙ্গ, মদনপুর, বোকাইনগর, গড়দালিপা, জঙ্গলবাড়ি প্রভৃতি তখন স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে জায়গা করে নেয়।

কামরূপরাজ পুনরায় কামরূপ উদ্ধারে সমর্থ হলেও, পূর্ব ময়মনসিংহের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। ইতোমধ্যে বাংলার শাসনভার দিল্লির হস্তগত হলে পূর্ববঙ্গের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় সোনাওগাঁও।

সেন রাজাদের শাসনের অবসান হয় ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনার মধ্যদিয়ে। কিন্তু ময়মনসিংহের জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এয়াড়াও ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসমষ্টি। ইসলাম ধর্মের প্রবেশ এই অঞ্চলে তখনও প্রত্যক্ষ হয় নি। তবে সমগ্র বাংলাদেশের সামাজিক দিক থেকে বিবেচরায় বলা যায় -

Dhaka University Institutional Repository

> "অষ্টম শতাব্দী থেকে বাংলার উপকূলবর্তী বাণিজ্যিক এলাকায় কিছু কিছু আরব ব্যবসায়ীর বসবাস, সুফি দরবেশ, শাসক ও সামরিক অভিযাত্রীদের সঙ্গে আগত সহচর সৈন্য, কর্মচারী ও ভাগ্যন্বেষীদের এদেশে বসতিস্থাপন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।"[৫]

এভাবেই ময়মনসিংহের জনবসতিতে আসে বিচিত্র ধর্মের-বর্ণের-রক্তের-সমাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

ঐতিহাসিক স্থাপনা :

১৭৮৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হলে বেগুনবাড়ি গোবিন্দগঞ্জ নামক স্তানে কোম্পানির কুঠিতে প্রশাসনিক কাজ শুরু হয়। কুঠিবাড়ি ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে ১৭৯১ সালে জেলা সদর হিসেবে নাসিরাবাদ নামক শহরটির সূত্রপাত হয়। যার পরিবর্তীত নাম ময়মনসিংহ শহর। কাজেই ময়মনসিংহ সদর উপজেলার প্রশাসনিক সদরদপ্তর এই ঐতিহ্যবাহী জেলা শহরেই অবস্থিত বিধায় তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। দুইশত চব্বিশ বছরের পুরনো এই শহরে রাজা, জমিদার ও নবাবদের নির্মিত ১৮টি ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ভবন বিদ্যমান। স্থাপনা ও ভবন গুলো হলো - আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল, শশীলজ, হাসান মঞ্জিল, ধলার জমিদার বাড়ি, কালীপুর জমিদার বাড়ী, তালডাঙ্গা হাউস, চাকলাদার হাউস, গোলপুকুর লজ, রাম গোপালপুর জমিদার হাউস, বুধা বাবুর দোতলা, গাঙ্গিনার পাড় জলটেঙ্কি সংলগ্ন ভবন, অঘোর কালোনি, মদনবাবুর বাড়ি, কেশব চন্দ্রের বাড়ি, নলিনী রঞ্জন ভবন, আকুয়া সেনবাড়ি।

নদ-নদী ও খাল-বিল :

ব্রহ্মপুত্রসহ প্রচুর নদীনালা রয়েছে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে। তবে এ অঞ্চলে হাওর না থাকলেও রয়েছে অনেক খাল-বিল যা লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে আসছে কিংবদন্তি বা লোকশ্রুতির মধ্যদিয়ে। একসময় ময়মনসিংহ অঞ্চল মাকড়সার জালের মতো নদ-নদী দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, কংশ, মগড়, ধনু, সোমেশ্বরী, সুতিয়া, নিতাই, বংশী, ঝিনাই, বানার প্রভৃতি নদ-নদী, উপনদী ও শাখানদী সমূহ এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত। শুধু তাই নয় ময়মনসিংহের পূর্ব-

Dhaka University Institutional Repository

সীমানা দিয়ে মেঘনা নদী এবং পশ্চিম সীমানায় যমুনা নদী প্রবাহিত হয়েছে। আর এ জন্য বলা যায় এসব নদ-নদী ময়মনসিংহের মানুষের জীবন-জীবিকায় উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে প্রাচীনকাল থেকেই।

বর্তমানে ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের উঁচু-নিচু পাহাড়ি এলাকাকে সমৃদ্ধ করেছে পাহাড়ি খরস্রোতা নদীগুলো। আর মধ্যস্থলে প্রবাহমান ব্রহ্মপুত্র এবং অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখানদী দ্বারা এ অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক ছাড়াও সমৃদ্ধ করেছে। ময়মনসিংহের অধিকাংশ অঞ্চলেই ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদীর পলি দিয়ে গঠিত। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রায় এ নদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বাসস্থান, খাবার, যাতায়াত সবকিছু ব্রহ্মপুত্রের ওপর নির্ভরশীল। ব্রহ্মপুত্র ছাড়াও অনেক নদীর গতিপথের সাথে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের গতি সম্পর্কযুক্ত। নৌকার মাঝি যে গান গেয়ে যায় তা এ অঞ্চলের নদ-নদীরই অবদান। চরের মানুষের পরিবর্তনশীল জীবনে আসে নানা কাহিনি যা লোকসাহিত্যের উপাদান। যাকে কেন্দ্র করে নানা প্রবাদ, প্রবচন, লোকগল্প, লোকসংগীত রচিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত লোকসংগীত :

লোকসংগীত হলো বাংলার লোকমানুষের প্রাণের সংগীত। কেউ কেউ লোকসংগীতকে লোকগীতি হিসেবেও অভিহিত করেছেন। লোকসংগীত গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখেই প্রচারিত। আধুনিক কালে শহর ও গ্রামীণ উভয় পরিবেশের লোকসংগীত আর কেবল মৌলিক ও স্মৃতিনির্ভর নয়, লিখিত আকারেও সৃষ্টি হচ্ছে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে এর প্রসার বাড়ছে।

একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করে লোকসংগীত রচিত হলেও জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, সমাজের, জাতির ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশ পায়। এর ছন্দে নেই কোনো জটিলতা। একবার কারও কানে ধরা দিলে সহজভাবেই তা আত্মস্থ হয়ে যায়। এর সুর এতই কোমল যে, সাধারণ হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। গানের ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার প্রাণস্পর্শী করে তোলে সাধারণ থেকে সকল শ্রেণীর মানুষকে। লোকসংগীতের উৎস বিবেচনায় বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসংগীত ভান্ডার হলো ময়মনসিংহ অঞ্চল। এ অঞ্চলের প্রচলিত লোকসংগীতগুলো হলো -

Dhaka University Institutional Repository

১. ঘাটু গান
২. পালা গান
৩. জারি গান
৪. সারি গান
৫. গাজীর গান
৬. বাউল গান
৭. ভাটিয়ালি গান
৮. মাজারের গান
৯. উড়ি গান
১০. কর্মসংগীত
১১. গাইনের গীত
১২. মেয়েলি গীত
১৩. কবিগান
১৪. বাইদ্যার গান
১৫. একদিল গান
১৬. বিষহরির পাঁচালি

ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

ময়মনসিংহের লোকসংগীতের বিশাল ভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বলা যায়, জীবনের সমস্ত কথাই যেন তাতে বলা হয়ে গেছে। জীবনের সকল পাওয়া না পাওয়ার হর্ষ-বিষাদময়, সুখ-দুঃখের কাহিনী সবই যেন বর্ণিত আছে এ সাহিত্যে। এমন কি, মনে হয় পল্লীবাসীর জীবন নিয়ে বলার মতো অবশিষ্ট্য বুঝি আর কিছু নেই। তবে এ সংগীত ভান্ডার একজনের দ্বারা তা হয়ে উঠেনি, যুগ যুগ ধরে এই সংহত সমাজবাসী নর-নারী জীবনের পলে পলে যা দেখেছে, যা অনুভব করেছে তাকেই বাণীদান করেছে তারা তাদের মনের ভাষায়। একজনের জীবনে যা ভাবা বা দেখা হলো না, পরবর্তীকালের আরেকজন তাকে পেয়েছে, মেতেছে তাকে নিয়েই। এমনি সাধনার ফলে সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে এ জেলার লোকসংগীত। ময়মনসিংহ অঞ্চলের এই লোকসংগীতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ক্রমান্বয়ে নিম্নে বর্ণিত হলো -

Dhaka University Institutional Repository

ঘাটু গান

ঘেটু, গাড়ু বা ঘাটু লোকসংগীতের এমনই একটি উল্লেখযোগ্য ধারা যা ময়মনসিংহ জেলাকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচয়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। লোকজ সংস্কৃতির ধারায় এ গান অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাটু গানের প্রচলন শুরু হয়। ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর, ফুলবাড়িয়া, ভালুকা, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল উপজেলায় এবং নেত্রকোনা অঞ্চলে এই গানের প্রচলন বেশি। এখনও এই অঞ্চলে ঘাটু গান সমানভাবে জনপ্রিয়। এখানকার নদী-নালা, হাওড়-বাঁওড়, বিল-ঝিল পরিবেষ্টিত অঞ্চলই এই গানের চারণভূমি। বছরের একটা নিদৃষ্ট সময় ধরে এ গান গাওয়া হয়। তবে উৎসবের দিন যেমন- রথ যাত্রা ও ফিরা রথ যাত্রায় এ গানের একটি বিশেষ আমেজ থাকে।

পালাগান

ইংরেজি Ballad কথাটি আমাদের দেশে 'গাথা' বা 'গীতিকা' নামে পরিচিত। দীনেশচন্দ্র সেন Ballad কে অভিহিত করেছেন 'গীতিকা' নামে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামগুলি দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত। আশুতোষ ভট্টাচার্যও গীতিকা বলে অভিহিত করেছেন ব্যালাডকে। সুকুমার সেন Ballad কে অভিহিত করেছেন 'গাথা' বলে। নানাজনে গ্রন্থন করে বলেই সম্ভবত এটি 'গাথা' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। সংস্কৃত ও পরবর্তী প্রাকৃত সাহিত্যে গাথা বলতে আখ্যানমূলক গীতি কবিতাকেই বোঝাত। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গীতিকা বা গাথার উদ্ভব হয়েছে। গাইবার জন্য রচিত হতো বলে গাথার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো সুরপ্রধান কাহিনি বর্ণনা। গাথা বলতে সাধারণত একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্যক্তিনিরপেক্ষ গীতিময় কাহিনিকে বোঝায়।

পাশ্চাত্য দেশীয় Ballad প্রধানত ঘটনা, পক্ষান্তরে বাংলা গাথা বা গীতিকা বর্ণনা। তবে বর্ণনার ফাঁকে নাট্যধর্মিতা বাংলা গীতিকায় সুরক্ষিত। কোনো চিত্তচাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনা অবলম্বনে তৎকালেই গায়েন ও বয়াতিদের পালাগান রচনা করা সুপ্রাচীন কাল থেকে পল্লীকবিদের ঐতিহ্য। আর এই বিচিত্র ঘটনার আবর্তেই উঠে আসে জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে সকল গীতিকা সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

প্রথমত : নাথ গীতিকা

দ্বিতীয়ত : মৈমনসিংহ গীতিকা

তৃতীয়ত : পূর্ববঙ্গ-গীতিকা

এই তিনটি ভাগের মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকা হলো প্রধান যা ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষ যুগ যুগ ধরে লালন করে আসছে। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ময়মনসিংহ গীতিকা। এগুলো লৌকিক জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনীকাব্য যা কেবল সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত 'পালাগান' বলে পরিচিত ছিল। পালাগুলোর প্রধান উপজীব্য বিষয় 'প্রেম'। ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমের কাহিনিই মূলত রূপায়িত হয়েছে পালাগুলোতে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পটভূমিতে এই পালাগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ।

জারি গান

ষোড়শ শতকে জারি গান শুরু হলেও এই গানের উৎকর্ষতা লাভ করে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত। এ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, খুলনা, বরিশাল চব্বিশ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক জারি গানের দল ছিল। এ সকল জেলার মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী ও ময়মনসিংহ গীতিকার দেশ ময়মনসিংহে জারি গানের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। লোকজ সংস্কৃতিতে ময়মনসিংহ অঞ্চল বরাবরই সমগ্র বাংলাদেশে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় জারি গানেও ময়মনসিংহ অঞ্চল বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিল। বিংশ শতাব্দির শুরুতে এ জেলায় এমন একটি গ্রামও ছিল না যেখানে কেউ জারি দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

সারি গান

সারি গান আবহমান বাংলার লোকসংগীত। নৌকার মাঝিরা একত্রে বসে বৈঠার তালে তালে যে গান গেয়ে নৌকা চালায় তাকেই সারিগান বলা হয়। তবে সারিবদ্ধভাবে বা একত্রে কাজ করতে করতে যে সংগীত গাওয়া হয় তাকেও সারি গান বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে নৌবা বাইচের সময় গাওয়া গানই সারি গান নামে পরিচিত। নদী বিধৌত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনার হাওর অঞ্চল, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার নিম্নাঞ্চলে সারি গান বেশ জনপ্রিয়।

গাজীর গান

শত শত বছর ধরে এই বাংলায় আগমন ঘটেছে পীর, ফকির, সন্ন্যসী, সুফী সাধকদের। যারা এই সমাজে প্রভাব ফেলেছে বিপুলভাবে। যাদের নাম নেয়া হয় শ্রদ্ধার সাথে। তেমনি একজন পীর সাধক গাজী পীর। সাধারণ জনগণ থেকে উচ্চবিত্ত সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে রয়েছে গাজী পীরের অগণিত ভক্তকুল। গাজীর গান, গাজীর পালা আর গাজীর পটের গায়েনের কণ্ঠে তাই গীত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা অঞ্চলে এই গাজীর গান এখনো বেশ জনপ্রিয়।

বাউল গান

বাংলা লোকসংগীতের একটি প্রধান ধারার নাম বাউল গান। সংসার-বিবাগী সাধক সম্প্রদায়কে বলা হয় বাউল। বাউল এক প্রকার লৌকিক অধ্যাত্ম-সাধনা। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই আধ্যাত্ম-সাধনাকে জীবন ও জগতের মুক্তির একমাত্র উপায়স্থল বলে ভেবেছে। প্রচলিত ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে পরিহার করে একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শের মাধ্যমে পরম সত্যকে খুঁজে পাওয়াই তাদের সাধনার লক্ষ্য। নানা মত ও পথের সংমিশ্রণে এই অতি গুঢ় মরমী সাধনতত্ত্বটি গড়ে উঠেছে। বাউলদের নিকট মানবদেহ বিশ্ববক্ষাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক। মনের মানুষরূপী পরম আরাধ্য ও পরম প্রিয় এই সাধনায় গুরু ও মুর্শিদেরও একটি প্রবল ভূমিকা রয়েছে। বাউল গানে গানের ভেতর দিয়েই কখনো রূপকে, কখনো বা সহজ কথায় বাউলের তত্ত্ব ও শাস্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে লোকজ গানের গাতক বাউল সাধকদের বিস্মৃতির কথা জানা যায়। বাউল গানের এসব শিল্পীরা স্বল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত হলেও তাদের গানের বাণীর গভীরতা যে কোন সচেতন মানুষের অন্তরেই নাড়া দিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপেন্দ্র সরকার, রশিদ উদ্দিন, জালাল খাঁ, উমেদ আলী, উকিল মুন্সীর বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাউল গানের অঙ্গিনা আজ অনেকটাই ম্লান। তারপরও বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জ জনপদ আজও বাউলগানের সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে। উপেন্দ্র সরকার, রশিদ উদ্দিন, জালাল খাঁ, উমেদ আলী, উকিল মুন্সীর গান বাংলা গীতি কবিতার ভান্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। এই বাউল গানের গায়কী এবং পরিবেশন শৈলীর চমৎকারিত্বের জন্য আজও ময়মনসিংহ অঞ্চলসহ সারাদেশে জনপ্রিয়।

ভাটিয়ালি গান

ভাটিয়ালি গানে আমাদের গ্রামীণ সমাজের আনন্দ-বেদনার ছবি ফুটে ওঠে। সাধারণ মানুষের অসংখ্য অভিব্যক্তি যেন আয়নার মতোই ভাটিয়ালি গানে দেখা যায়। নদী ও হাওর প্রধান, পূর্ব ময়মনসিংহ ও সিলেটের নিম্ন অঞ্চলে এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। ভাটিয়ালি কথাটির সাথে স্রোতের ভাটির দিকে যাওয়ার সম্পর্ক আছে। ভাটির দিকে নৌকা ছেড়ে মাঝি লম্বা টানে ভরা সুরে এই গান গায়। ভাটির টানে নৌকা চললে মাঝিদের শ্রম লাঘব হয়। তখন তারা অনায়াসে লম্বা টানে গলা ছেড়ে গান গাইতে পারে। তবে শুধু মাঝিরাই এই গানের গায়ক নয়। মাঠে কাজের অবসরে কৃষক বা বিশ্রামরত রাখালও ভাটিয়ালি সুরে গান গেয়ে থাকে। ভাটিয়ালি মূলত একক সংগীত। লম্বা টানে গায়ক তার ভেতরের আবেগকে প্রকাশ করে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কাণেই অনেক লোককবি তাদের মনের আশা, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি নানা বিষয় ব্যক্ত করেছেন ভাটিয়ালি গানের মাধ্যমে।

মাজারের গান

বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও এর আশপাশের জেলাগুলোতে বহু বছর ধরে মাজারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে নানা মত ও বিশ্বাস। সে দিক থেকে সিলেট হলো ভক্ত আশেকানদের তীর্থস্থান। তাছাড়া দেশের অন্যান্য জেলার মতো ময়মনসিংহ জেলার প্রতিটি উপজেলাতেই রয়েছে অনেক মাজার। মাজারসমূহে ভক্ত আশেকানরা আরাধনা করে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া মাজারগুলোতে প্রতি বছর বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হয়। ওরস তাছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভক্তবৃন্দের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উড়ি গান

উড়ি গান মূলত 'হোলি' খেলাকে কেন্দ্র করে গাওয়া হয়। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এলাকায় প্রতিবছর 'হোলি' খেলা হতো। বর্তমানেও এ অঞ্চলে হোলি খেলাকে কেন্দ্র করে উড়ি গান গাওয়া হয়ে থাকে। এক বাড়ি থেকে গান শুরু করে অন্য বাড়ি হয়ে পাড়া ঘোরা হয় এবং সবার ঘর থেকে চাল, ডাল তোলা হয়। এগুলো নিয়ে রান্না করে সবাই এক সঙ্গে খাওয়া হয়। উড়ি গানের সময় সং ছিটানো এবং প্যাক খেলার নিয়ম রয়েছে। সবচেয়ে একটি মজার ব্যাপার হলো প্রতিবেশি কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ থাকলে বছরের ওই দিনটিতে বিবাদ মিটে যায়।

কর্মসংগীত

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলা শ্রমিক শ্রেণির লোকেরা বিভন্ন কর্মসংগীত পরিবেশন করেন তাদের কাজের সময়। যেমন, কোনো নির্মাণ শ্রমিক ইট টানার সময় কিংবা ছাদ তৈরির সময় কিছু উদ্দীপনামূলক কথা উচ্চারণ করেন। এসব কথা ও সুরের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। তাৎক্ষণিকভাবে যা মনে আসে তাই সুর করে বলেন। একজন সুর তুললে অন্যরাও তাতে দোহার দেন। এতে কাজের মধ্যে উৎসাহ জাগে।

গাইনের গীত

'গাইতে গাইতে গায়েন, আর বাজাতে বাজাতে বায়েন'- এই গায়েনই ময়মনসিংহে 'গাইন' এবং তার সঙ্গী বাদকদল 'বাইন' নামে পরিচিত। উনিশশত পঞ্চাশ ও ষাট দশক পর্যন্ত গাইনের গীত প্রচলিত ছিল ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে। গাইনের একজন সহকারী গায়ক থাকে তাকে বলা হয় 'পাইল'। অবশ্য গান গাইতে গাইতে পারদর্শিতা লাভ করে গাইন হয় না, গাইন হল বিশেষ এক গ্রাম্য গায়ক। কোনো বালা-মুসিবত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অথবা কোনো কল্যাণকর কাজকে নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে গাঁয়ের মেয়ে লোকেরা 'একপালা গাইনের গীত' মানত করত। সংগীত ও নৃত্য-নির্ভর গাইনের গীত বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের হাস্য-রসে পরিপূর্ণ এবং ব্যঙ্গ-রসাত্মক, বিদ্রুপাত্মক এক প্রকার আকর্ষণীয় লোকনাট্য-অনুষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েলি গীত

লোকসংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে মেয়েলি গীত। ময়মনসিংহ জেলার প্রায় সব অঞ্চলেই এই মেয়েলি গীত প্রচলিত। গ্রাম বাংলার অন্যান্য লোকসংস্কৃতি যেমন জারি গান, সারি গান, কবি গান, একদিল গান, ঘাটু গানের চেয়ে এই মেয়েলী গীতের ঐতিহ্য অধিকতর প্রাচীন। বিভিন্ন উৎসব, নববর্ষ, বিয়ের অনুষ্ঠান, জন্মানুষ্ঠান বা অন্য কোনো সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ অঞ্চলে মেয়েলি গীত পরিবেশিত হতে দেখা যায়। একজন গীত শুরু করলে দেখা যায় আশেপাশের নারীরাও পালা মেলাচ্ছেন। নারীর হাসি-কান্না, কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা গীত সুরে মেয়েলী গীতে ব্যক্ত হয়। মেয়েলী গীতের রচয়িতা গ্রামীণ সমাজের সাধারণ নারীরাই।

কবিগান

ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় কবিগানের প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ময়মনসিংহ অঞ্চলে কবিগানের সূচনা। বর্তমানে কবিগানের আসর ময়মনসিংহ অঞ্চলে তেমন হয় না বললেই চলে। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট অঞ্চলে মাঝেমধ্যে এই কবিগানের আসর বসে। কবিগান প্রতিযোগিতামূলক এক ধরনের লোকসংগীত। কবির লড়াই দিয়ে এই গানের শুরু হয়। আর সমাপ্তি ঘটে কবির মিলন গানের মধ্যদিয়ে।

বাইদ্যার গান

ময়মনসিংহে ‘বাইদ্যানীর গান’-এর সংগে ‘বাইদ্যার গান’-এর তেমন কোনো পার্থক্য নেই। যতটুকু পার্থক্য রয়েছে, তা নামকরণের দিক থেকেই। বর্তমান ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ঈশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর, ত্রিশাল ও মুক্তাগাছায় এখনও বাইদ্যার গান পরিবেশিত হয়ে আসছে। এটি মূলত গান-প্রধান নাট্যপালা। একে লোকনাট্যও বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

একদিল গান

পীর হয়রত আহমদ উল্লাহ রাজী 'একদিল' খেতাবে ভূষিত হবার পর থেকে একদিল নামেই প্রতিষ্ঠিত। ধারণা করা হয়, সাহিব দিল শব্দটি অপভ্রংশে সাহ্-ইর দিল > সাহ-একদিল এবং তা থেকে সাহ-একদিল শব্দে রূপান্তরিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একদিলের শব্দগত অর্থ এক বা অদ্বিতীয় হৃদয়। অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী। পরবর্তীতে সাহ্ শব্দটি হয়ত উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া, ভালুকা ও মুক্তাগাছা উপজেলার অনেক গ্রামে একদিল গান প্রচলিত রয়েছে। মূলত লোকবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত 'মানত' প্রথা থেকেই এ গানের আয়োজন করা হয়।

বিষহরির পাঁচালি

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের বাজার সংলগ্ন ধামদি গ্রামে বিশ্বকর্মা ও বর্মণদের পাশাপাশি বাস। প্রতিবছর এই গ্রামে শ্রাবণ সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাসব্যাপী মনসাপূজার মধ্যদিয়ে পাঠ হয় পদ্মপুরাণ বা বিষহরির পাঁচালি। দ্বিজবংশী দাসের লেখা পদ্মপুরাণ বা বিষহরির পাঁচালিই মূলত পরিবেশিত হয়। পরিবেশনের জন্যে রয়েছে একজন মূল গায়েন এবং গায়েনকে সহযোগিতার জন্যে রয়েছেন একাধিক মহিলা ও পুরুষ পাইল। বিষহরি পাঁচালিতে পাইলরাই যন্ত্রীর ভূমিকা পালান করেন।

তথ্যনির্দেশ

১. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়বৈচিত্র্য

প্রতিটি অঞ্চলে লোকসংগীত প্রতিষ্ঠার পেছনে উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ, কৃষিজীবী জনমানসের সংস্কারগত চিন্তা-ভবনা, বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসব অনুষ্ঠান, জগৎ ও জীবন সম্পের্কে ঔৎসুক্য ও জিজ্ঞাসা, বাংলার নিসর্গ শোভা, নদী ও নৌকার রূপকাশ্রয়ী চিন্তা চেতনা, সমাজের অন্যায় অবিচার এবং অলৌকিক বিশ্বাস সহায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যার ফলে গ্রাম-বাংলার নিরক্ষর মানুষ গান বেঁধেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতেও এই প্রভাব বিদ্যমান। অত্র অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীতগুলো নিজ নিজ বিষয়বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তিকরে রচিত হয়েছ। প্রচলিত প্রতিটি লোকসংগীতের বিষয় বিবেচিত হয়েছে অত্র অঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রামের সাধারণ মানুষের পাওয়া-না পাওয়া, সুখ-দুঃক, অনন্দ-বেদনা, গ্রাম্য উৎসব-অনুষ্ঠান, লোক-সংস্কার ও বিশ্বস ইত্যাদি'র উপর নির্ভর করে। আলোচ্য অধ্যায়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত লোকসংগীতের বিষয়বৈচিত্র্য আলোচনা করা হলো -

'ঘাটু গান' বাংলাদেশের লোকসংগীত প্রাধান্য বিবেচনায় ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শাশ্বত বাংলার লোকসংগীতের যে রূপ তার সবটাই জুড়ে ঘাটু গান বিদ্যামান। ঘাটু বলতে মূলত নাচনেওয়ালীকেই বোঝায়। ঘাটু দলে একজন থাকেন মূল গায়ক, বাকিদের বলা হয় বাহার। অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ঘাটু গানের গীতিকারদের মুন্সীয়ানাও লক্ষণীয়। ঘাটুগানের দর্শকের মূল আকর্ষণ হচ্ছে 'ছুকরি'। ছুকরিকে পেশাদার হিসেবে মূল গায়েন নাচ-গান শিখিয়ে পারদর্শী করে তুলা হয়। দশ থেকে পনেরো বছর বয়সের ছোকরাকেই ঘাটু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঘাটু গানে বিশেষত রাধা-কৃষ্ণের মধুর প্রেমরসাত্মক বিষয়ের প্রাধান্য পায়। আবার ব্যঙ্গাত্মক বিষয়ও আছে ঘাটু গানে। তবে মূল বিষয় প্রেম, বিরহ এবং বিচ্ছেদ। ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম, জুরি সহযোগে যখন এই গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয় তখন এ গানের মূল বিষয় ও প্রেক্ষাপট ফুটে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

'পালা গান' বা 'গীতিকা' লোক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশে প্রচলিত এবং সংগৃহীত গীতিকাগুলির মধ্যে মৈয়মনসিংহ গীতিকা অন্যতম। মৈমনসিংহ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত গীতিকাগুলি বাঙ্গালির ঐশ্বর্যমন্ডিত কালজয়ী বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ হিসেবে দেশে-বিদেশে সমাদৃত। মৈয়মনসিংহের বিল-ঝিল দিগন্ত বিস্তৃত হাওর সুজলা সুফলা মাটি ও সবুজ অরণ্যাদি বেষ্টিত নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এবং সদরের নান্দাইল আমাদের মৈমনসিংহ গীতিকার পশ্চাৎভূমি। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনিগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে প্রাচীন সমাজের বহু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে। ইচ্ছামতো বর গ্রহণ, বয়সকালে বিবাহ, স্বাধীন প্রেম ইত্যাদি সবই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। সাধারণত গীতিকার উপজীব্য বিষয় হলো প্রেম-বিরহের স্বাভাবিক প্রচ্ছায়ায় বিয়োগান্তক আবহ সৃষ্টি করা। মৈমনসিংহ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত মহুয়া, মলুয়া, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, রূপবতী এই পালাগুলি মূলত খাঁটি প্রেমকাহিনীমূলক পালা। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই পালাগুলোতে প্রেমের প্রাধান্য লক্ষনীয় এবং পালাগুলোতে মানবীয় প্রেমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থান পেয়েছে। ধর্মভিত্তিক প্রেম বিবেচনায় ময়মনসিংহ গীতিকার 'চন্দ্রাবতী' পালাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'চন্দ্রাবতী' থাকে ব্রাহ্মণ কন্যা। এই পালায় চন্দ্রাবতী তার নিজের স্বামী নিজে বেছে নিতে পারে না। তার পিতা নিজেই বর নির্ধারণ করে-

"ভালো ঘরে ভালো বরে কন্যার হউক বিয়া।"[১]

তাই জয়ানন্দ যখন তাকে পত্র লেখে সে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দেয় -

"মোর ঘরে আছে বাপ আমি কিবা জানি।"[২]

রূপক-প্রণয় গীতিকা হিসেবে 'কঙ্ক ও লীলা' একটি উল্লেখযোগ্য গীতিকা। বিষয়বৈচিত্রের দিক থেকে এই ধরণের পালায় রূপকের আশ্রয় বেশি থাকে। লীলার সঙ্গে কঙ্কের যে প্রেম তা প্রথমে বাস্তব প্রেমেরই বর্ণনা ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে তাতে কিছুটা রূপকত্ব আরোপিত হয়েছে। সেই জন্যই এ পালায় সৌন্দর্য বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। মনে হয় পরবর্তী সমাজের চাহিদা মেটাতে গিয়ে - যেহেতু লীলা ব্রাহ্মণ কন্যা- সেহেতু এই রূপকত্বের আবরণ। লীলা যেন এখানে বৈষ্ণব কাব্যের সেই সৌন্দর্যের প্রতীক, যাকে শুধু নিষ্কুলুষ চিত্তেই ভাবা যেতে পারে। তাছাড়া মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি বিবাহোত্তর প্রেমের একটি উৎকৃষ্ট নজির।

Dhaka University Institutional Repository

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুকূল্যে চন্দ্রকুমার দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মৈমনসিংহ গাথা সংগ্রাহক হিসেবে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের কাছ থেকে নিম্নের পালাগুলো সংগ্রহ করে আনেন যা মৈমনসিংহ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- মহুয়া (রচয়িতা - দ্বিজ কানাই)
- চন্দ্রাবতী (রচয়িতা - নয়নচাঁদ ঘোষ)
- কমলা (রচয়িতা - দ্বিজ ঈশান)
- দেওয়ানা মদিনা (রচয়িতা - মনসুর বয়াতি)
- দস্যু কেনারামের পালা (রচয়িতা - চন্দ্রাবতী)
- কঙ্ক ও লীলা (রচয়িতা - দামোদর দাস, রঘুসুর, শ্রীনাথ বেনিয়া এবং নয়নচাঁদ ঘোষ প্রণীত)
- মলুয়া
- দেওয়ান ভাবনা (রচয়িতা - চন্দ্রাবতী)
- কাজলরেখা
- রূপবতী

'জারি' ফার্সি শব্দ। জারি শব্দের অর্থ ক্রন্দন বা বিলাপ। নৃত্যসম্বলিত সংগীত হলো জারিগান। জারিগানের মূল বিষয় কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদত বরণের ঘটনা। ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে যে জারিগান গাওয়া হতো এবং এখনও হচ্ছে তা কারবালার জারি বলে অভিহিত। কারবালার জারি পরিবেশেন করা হয় বিভিন্ন পুঁথি ও মীর মশাররফ হোসেন-এর '*বিষাদসিন্ধু*' গ্রন্থ থেকে। পুঁথিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-'জঙ্গনামা' ও 'শহীদের কারবালা'। জারিগানে একজন বয়াতি বর্ণনা করেন। তাঁর সঙ্গে থাকে একজন ডায়না ও দশের অধিক দোহার। ময়মনসিংহে এই জারিগানের বিচিত্রতা দেখা যায়। ধর্মীয় কাহিনির সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা, ব্যক্তিবিশেষের জীবনকথা, রঙ্গব্যঙ্গাত্মক কল্প-গল্প ইত্যাদি জারিগানের বিষয় হিসেবে দেখা যায়। অনেক সময় মূল কাহিনির মাঝে মাঝে ব্যঙ্গাত্মক কাহিনি বলে থাকে যাকে স্থানীয় ভাষায় 'ফড়ি' বলে। এসব ফড়ি উদাহরণ হিসেবেই ব্যবহার করে থাকেন তাঁরা। গৌরীপুরে কারবালার নির্মম কাহিনিনির্ভর জারি পরিবেশিত হলেও

Dhaka University Institutional Repository

এখানকার কিছু কিছু জারি গানে রয়েছে অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা। জারির একটি পংক্তিতে সে চেতনার বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় -

"রাম-লক্ষণ গেছে রে বনে অযোধ্যা ছেড়ে
ঐ রকম গেছে রে দুই ভাই মদিনা শূন্য করে।"[৩]

'গাজীর গান' সপ্তদশ শতকের বাংলার মুসলমান সমাজে পূজিত গাজী পীরের লৌকিক-অলৌকিক কাহিনীকেন্দ্রিক কৃত্যমূলক 'পীর পাঁচালি'। মুসলমান সমাজের নিত্য অভাব ও হিন্দু উপকথায় বর্ণিত সত্যনারায়ন কিংবা অন্যান্য বীরগাথার অনুসরণে রচিত হয়ে গাজীর গান আজ কিংবদন্তী এবং তৎকালে জীবন্ত সত্য বলে প্রতিভাত। বিভিন্ন আনুপূর্বিক ধাপে বর্ণিত হয়েছে গাজীর আখ্যান। এই ধারাবাহিকতা এখনও ময়মনসিংহ, ভালুকা, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ অঞ্চলে বহমান। এইসব অঞ্চলে গাজীর গান এখনও বেশ জনপ্রিয়। কেননা তাদের বিশ্বাস গাজী সকল বিপদের ত্রাণকর্তা। তাই রোগ-শোকমুক্তি, নবজাতকের কল্যাণ, শস্যহানি, মড়ক উপলক্ষে গাজীর গান মানত করা হয়। এই মানতকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয় পালা। কখনও দুই দিনের পালা, কখনও দেড় দিনের, সর্বোচ্চ সাত দিনের পালা অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ অঞ্চলের গাজীর গানে। যাঁরা মানত করেন তাঁরা এই পালার আয়োজন করেন। এ সময় তাঁরা গায়েন দলকে রাত-দিন থাকা-খাওয়া ছাড়াও পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন।

'বাউল গান' একান্ত করেই সাধন-ভজনকে কেন্দ্র করে রচিত। এই গানে সাধনমার্গের তত্ত্বগুলি রূপকের আবরণে ও সংগীতের মাধ্যমে সাধকদের নিকট প্রচারিত। পুরানো বাউল গানগুলো লক্ষ্য করলে পরিলক্ষিত হবে যে, বাউল গানে প্রাচীন বৌদ্ধ দোঁহা বা চর্যাপদের বেশ মিল রয়েছে। বাউল দর্শনে ধর্ম সাধনার বাণী আছে। একতারার সুর ঝংকারে সে বাণী হৃদয় থেকে হৃদয়ে অনুরণন তোলে। বাউলদের সাধনা সহজ পথের সন্ধান। মানবদেহই বাউলদের সাধনার মূল কেন্দ্র। 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহ ভাণ্ডে।' বাউলদের গানেরও মূলসুর এই জীবনসাধনা। সুফি ও যোগ সাধনার মাধ্যমে এরা সাধনাকার্যে লিপ্ত হয়। বাউলরা রেত বা বিন্দুকে জীবনের প্রধান অবলম্বন বলে মনে করে। বিন্দুকে ধারণ করেই জীবন, এই বিন্দু-ই সব শক্তির আধার। এর মাধ্যমে মহাসিন্ধুকে অবলোকন করতে হবে, তাকে আপনার অন্তরে স্থাপন করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। সাধনার এই বিন্দুকে উর্ধ্বগামী করতে হয়। অর্থাৎ মানবদেহই হলো বাউল গানের মূল আলোচ্য বিষয়। তবে বাউল দর্শন প্রতিষ্ঠা মূলত গুরুবাদ,

Dhaka University Institutional Repository

সহজিয়াবাদ ও শূন্যবাদের ওপর। তবে অঞ্চল ভেদে বাউল গানের বিষয়, সুর ও গায়কীর পার্থক্য দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দির শুরু থেকে বিংশ শতাব্দির সত্তরের দশক পর্যন্ত ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাউল গান, গান রচয়িতা ও গায়কদের উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতকের বাউল সাধনা থেকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউল সাধনা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। যার গভীরে ছিল মানব প্রেম ও প্রকৃতি প্রেমের সমন্বয়ে সৃষ্ট মানবতাবাদী চেতনা। ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, সোনাই, কমলা, মদিনার চরিত্র পালাগানে মঞ্চায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ নিরক্ষর চাষা মজুর জনগোষ্ঠী অত্রাঞ্চলে মানব প্রেমের যে ভুবন গড়ে তোলেন, সে ভুবনে সুরের ঝংকার সৃষ্টিতে মানব প্রেম ও প্রকৃতি প্রেমের চেতনাকে গতিশীল করার প্রয়াস ছিল এ অঞ্চলের বাউল গানে। বিষয়বৈচিত্র্য বিবেচনায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউল গানে সৃষ্টিতত্ত্ব ভিত্তিক বাউলগানগুলোর শব্দ চয়ন, ভাষা, মর্মবাণী, সুর সংযোজন সত্যি অতুলনীয়। বাউল রশিদ উদ্দিনের কথা-

"এ বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে রেখেছ সাজাইয়া।"[৪]

সৃষ্টিতত্ত্ব ভিত্তিক এ গানটিতে রয়েছে শিল্পী সুলভ দরদী মনের বাস্তব প্রকাশ। ময়মনসিংহ অঞ্চলে গুরুতত্ত্ব বিষয়ক গানগুলোও ছিল খুব উচ্চমানের। মূলত ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে মানব প্রেমে উজ্জীবিত করাই ছিল ময়মনসিংহের বাউল গানের মূল বিষয়। তাছাড়া ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউল গানে দেহতত্ত্ব, লোক তত্ত্ব, বিচ্ছেদ তত্ত্ব, গানগুলি খুবই চমৎকার।

'ভাটিয়ালি' মূলত ভাটি অঞ্চলের গান। 'ভাটি' শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'আল' প্রত্যয় যোগ করে 'ভাটিয়াল' অতঃপর 'ভাটিয়ালি' শব্দগঠিত হয়েছে। ভাটিয়ালির নামকরণের অর্থ নানা জনে নানাভাবে করেছেন। কেউ বলেন, নদীর ভাটির স্রোতের টানে নৌকা ভাসিয়ে মাঝি যে গান করে, তাই ভাটিয়ালি গান। কেউ বলেন, বাংলার ভাটি অঞ্চলের নৌকা-মাঝির গান হলো ভাটিয়ালি গান।

বিষয়ের দিক থেকে ভাটিয়ালির তিনটি প্রধান ভাগ আছে।

যথা : লৌকিক প্রেম,
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং
আধ্যাত্মিকতা।

এই তিনটি ধারার মধ্যে লৌকিক প্রেম-বিরহের ভাটিয়ালি গানই আদি স্তরের। ময়মনসিংহ অঞ্চলে লৌকিক প্রেম এবং অধ্যাত্মিকতা পর্যায়ের ভাটিয়ালি গানের প্রচন অধিক। গানের বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাটিয়ালির সুর প্রধানত করুণ। লৌকিক প্রেমের গানে বিরহ-বিচ্ছেদ এবং অধ্যাত্মিক গানে অনিত্য সংসারের হতাশা-নৈরাশ্য এবং ঈশ্বরকে না পাওয়ার শূন্যতা-বেদনা প্রকাশ পায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাটিয়ালি গানে।

'মাজারের গান' ময়মনসিংহ অঞ্চলে বহু বছর ধরে প্রচলিত। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ময়মনসিংহ ও এর আশপাশের জেলাগুলোতে মাজারের গান অধিক প্রচলিত। গানের তালে ভক্তবৃন্দ মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে নেচে নেচে জিকির করে মাজারের গান পরিবেশন করে থাকে। দয়ালের প্রেমে হন অশ্রুসিক্ত। এটাই ময়মনসিংহ অঞ্চলের মাজারের গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মাজারে পরিবেশিত হওয়া এই গানগুলো মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হয়। গানগুলোতে দেহতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, জীবাত্মা-পরামাত্মার সম্পর্কিত বিষয় স্থান পায়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের মাজারের গানগুলো আপাতদৃষ্টিতে শুনলে মনে হবে সাধারণ নরনারীর প্রেমের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু, সাধারণ নরনারীর রূপকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাদের স্রষ্টাপ্রেমের গভীর তাৎপর্য। মূলত মাজারের গানের মাধ্যমে ভক্তবৃন্দ গুরুর কৃপা বা দিদার লাভের চেষ্টা করে। মাজারের গানের উদাহরণ -

"কাছে আইসা ভালোরে বাইসা কইয়া যাওরে দয়াল তুমি আমারে
হাশরের মিজানে আমার নি হইবা তুমি
আমার লগি দুইটি কথা কইবা নি তুমি দয়াল-২
তুমি যদি হওরে আমার
আমার যদি হও তুমি
আমি আর ভয় করি না অন্তরে।
তুমি আছ আমার আমি হইলাম তোমার
জগদবাসী জানেরে দয়াল, জগদবাসী জানে
আল্লাহু, আল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসুল।"[৫]

এই গানে ভক্ত তার পরম করুণাময় আল্লাহর কৃপা প্রার্থনা করছে। কারণ হাসরের ময়দানে বিচারের সময় সকল পাপ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো সৃষ্টিকর্তার করুণা।

Dhaka University Institutional Repository

'উড়ি গান' ময়মনসিংহ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে এখনও প্রচলিন আছে। উড়ি গানের বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ। সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই উড়ি গান গাওয়া হয়। খুব সহজ সুর ও আনন্দ রসের উপস্থিতিই উড়ি গানের মূল বৈশিষ্ট্য।

যেমনঃ

"কমলকে পাইয়া তুমি
কমল তুমি হারাইলে
আশা কমল পাশে কমল
ঝুলে রইলে কমলে।
পাইয়া কমলে সঙ্গী
কমলে হইলে বন্দি
পাইয়া ননদি কমল।"[৬]

'গাইনের গীত' একসময় বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ময়মনসিংহ অঞ্চলের গাইনের গীতের উপজীব্য বিষয়গুলো হলো-গরীবের বাজার করা, পকেটমারের উৎপাত, নব্য যুবকদের বিড়ম্বনা, শহরের ললনাদের বিচিত্র পোশাকে ঘুরে বেড়ানো, বাজার বা গাড়িতে ফেরিওয়ালার ক্যানভাস এবং বাস্তবতার নিরিখে সমসাময়িক বহু অসঙ্গতি স্থান পায় গাইনের গীতে। একজন গায়েন একদল দোহার নিয়ে গাইনের গীত পরিবেশন করে থাকেন। গায়েন দর্শক শ্রোতাদের সমনোরঞ্জনের পাশাপাশি হাস্যরসের মোড়কে সমাজের নানার অসঙ্গতিও তুলে ধরেন গাইনের গীতের মাধ্যমে। কারণ গাইনের গীতের মূল উদ্দেশ্য হলো আনুষ্ঠানিকভাবে আনন্দ-ফূর্তি করা। হাস্যরস ও সুরের মাধ্যমে গাইন খন্ড খন্ড ঘটনা-গল্প তুলে ধরেন অথবা একটা কাহিনিই তুলে ধরেন দর্শক-শ্রোতার সামনে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিষয়ে সংগীত নির্ভর একপ্রকার কমিক গানই গাইনের গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'কবিগান' ময়মনসিংহ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে এখনো বেশ জনপ্রিয়। **'কবিগান'** যাঁরা পরিবশেন করে তাঁদের 'সরকার' বা 'কবিয়াল' বলা হয়। এ গানের আসরে দুইজন সরকার বা কবিয়াল একজন আরকেজনের প্রতিপক্ষ হয়ে আসর গেয়ে থাকেন। সাধারণত হালখাতা, পুণ্যাহ্, পূজা-পার্বণ, কিংবা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরাই কবি গানের আসর বসাতেন। অনেক সময় গ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

লোকেরা চাঁদা তুলেও কবি গানের আসর বসাতেন। কবিয়ালরা সাধারণত পাজামা ও পাঞ্জাবি পরেই কবিগান গেয়ে থাকেন। তাঁদের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কিছু অঙ্গভঙ্গি করতে হয়। তবে শরীরের তালটা রাখতে হয় সারাক্ষণ। ময়মনসিংহ অঞ্চলে বর্তমানে হালুয়াঘাট ও অন্যান্য কিছু স্থানে কবিগানের প্রচলন রয়েছে। এই গানের বিষয়বৈচিত্র্য হিসেবে একাধারে যেমন মেলে ধর্মের উপাখ্যান, দর্শনের দুরূহ ও গুরুতত্ত্ব, অপরদিকে তেমনি পরিচয় মেলে এ গানের রচয়িতা পল্লী কবিদের সহজাত কবিত্ব শক্তির।

'মেয়েলী গীত' ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে গ্রাম্য মেয়দের গাওয়া গীত। যুগ যুগ ধরে গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ ঘরেই এই গীত চালু রয়েছে। অনভিজাত পল্লীর অনুন্নত সমাজের অনাড়ম্বন গ্রাম্য জীবনে মেয়েলী গীত নিরক্ষর পল্লী রমণীদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সহজ ভাবধারায় নিরেট গ্রাম্য ভাষায় বাংলার নিভৃত পল্লী কোণের পল্লী নারীর সত্যিকার রূপ, সহজ স্বাভাবিক অভিব্যক্তি প্রকাশ ঘটে ময়মনসিংহ অঞ্চলের মেয়েলী গীতে। অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীরা সহজ ও সরল-সহজ তাদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, প্রেম-পরিণয়, সহজ তাদের জীবনও। ময়মনসিংহ অঞ্চলের মেয়েলী গীতে তারই অতি সাধারণ প্রকাশ ঘটে। ভাব ও ভাষার জটিলতার বালাই নেই মেয়েলী গীতে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই গীত নানা সুরে, নানা ভাবে গীত হয়।

'বাইদ্যার গান' বেশ জনপ্রিয় ছিল ময়মনসিংহ অঞ্চলে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে এক সময় দু'চার গ্রাম বাদেই দুই-তিনটি লোকনাট্যদলের অস্তিত্ব ছিল। যেমন: বাইদ্যার দল, রূপবানের দল, গুনাইবিবির দল প্রভৃতি। বর্তমানে ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাইদ্যার গান একেবারেই অপ্রতুল। তারপরও বছরে একবার সৌখিনভাবে বাইদ্যার গান, রূপবানের গান ও গুনাইবিবির গান ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত হয়ে আসছে। যদিও এগুলো লোকনাট্যপালা তারপরও পালাগুলো গান-প্রধান বলে বাইদ্যার গান হিসেবেই পরিচিত। বাইদ্যার গানের কাহিনীর মূল বিষয় হলো অধর্ম ও ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ। ফলে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট, ছোট ও বড় নিয়ে যুদ্ধে নামে তারা।

'একদিল গান' ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফুলবাড়িয়া, ভালুকা ও মুক্তাগাছা উপজেলার অনেক গ্রামে প্রচলিত রয়েছে। সাধারণত কারো রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি, সন্তান-কামনা, মামলার বিজয়, আর্থিক বা বাণিজ্যিক উন্নতি অর্থাৎ মনোবাসনা পূরণের আকাঙ্ক্ষায় ফরমায়েশিভাবে একদিল গানের আয়োজন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজনকারীগণ গানের বয়াতি সহশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্র শিল্পীগণকে খাসি বা মোরগ জবাই করে ভোজন করান এবং টাকা বা উপহার প্রদান করেন। এর ফলে অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে বলে প্রচলিত আছে।

'বিষহরির পাঁচালি' ময়মনসিংহ অঞ্চলে এখনো বেশ জনপ্রিয়। নানা নিয়ম কানুনের উপর ভিত্ত করে দীর্ঘ একমাস ধরে পাঠ করা হয় এই বিষহরির পাঁচালী। মূলত মনসা দেবীর পূজা এবং গুলকীর্তন, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী এই গানের মূল বিষয়।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৩, পৃ. ১০৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৩. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ৩৯৪

৪. গোলাম এরশাদুর রহমান, *নেত্রকোণার বাউল গীতি*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃ. ৩৪

৫. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ১৪২

৬. প্রাগুক্ত,

তৃতীয় অধ্যায়

ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য

ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকজীবনের সাথে সে অঞ্চলের লোকসংগীতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীতের প্রতিটি শাখাই ভাব, বিষয়, উপস্থাপনা এবং লোকপ্রিয়তা এবং সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য। ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের সাহিত্যগুণ বিচারে প্রচলিত লোকসংগীত গুলোর সাংগীতকি বৈশিষ্ট্য নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো -

ঘাটু গান

ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর, ফুলবাড়িয়া, ভালুকা, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল উপজেলায় ঘাটু গানের প্রচলন বেশি তাছাড়া নেত্রকোনা জেলাতেও ঘাটু গানের প্রচলন আছে। ঘাটু দলে একজন থাকেন মূল গায়ক, বাকিদের বলা হয় বাহার। মূল গান করেন বয়াতি, আর বাহাররা একত্রে ধুয়া গায়, শরীর দুলিয়ে সুরের সাথে হাততালি দেয়, মাথা নাড়ে আর একত্রে উচ্চধ্বনি করে উঠে। ঘাটুগানের দর্শকের মূল আকর্ষণ হচ্ছে 'ছুকরি'। গানের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে ছুকরি। ঘাটু গানে ঢোলক, করতাল, খঞ্জরী, জুড়ি, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাহারদের সাধারণ পোশাকই পরিধান করতে দেখা যায়, তবে বয়াতি আর ছুকরির পোশাক ভিন্ন থাকে। বয়াতি রঙিন পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গলায় গামছা পরিধান করেন আর ছুকরিকে শাড়ি, গয়না ইত্যাদি সাজসজ্জা করে থাকে।

ঘাটু গান বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। দেব-দেবী বন্দনার পর হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত সবাইকে সালাম জানায় এবং ওস্তাদের নাম স্মরণ করা হয়। মাঝে মাঝে ছম গান করেন, এর মাঝে আদিরসাত্মক কথাও স্থান পায়। ঘাটুগানগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, চার-ছয় চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই চরণগুলোই তারা ঘুরে ফিরে বারবার বলতে থাকেন। ময়মনসিংহের উল্লিখিত অঞ্চল গালোর মধ্যে নিম্নে ফুলবাড়িয়ার ঘাটু গানের বর্ণনা তুলে ধরা হলো -

ফুলবাড়িয়ার ঘাটুগান :

ফুলবাড়িয়া অঞ্চলে এখনও ঘাটুগানের প্রচলন রয়েছে। তবে আগের মতো নয়। ফুলবাড়িয়া অঞ্চলে ঘাটুগান পরিবেশন করার রীতি অন্যান্য অঞ্চলের ঘাটুগানের মতোই।

Dhaka University Institutional Repository

ঘাটুর পরিচয় :

দুইজন ঘাটু দুই পক্ষ নিয়ে নাচ গান পরিবেশন করে। একপক্ষ রাই অন্যপক্ষ শ্যাম। রাই চরিত্রে ছেলে মেয়ের সাজ নেয় । আর শ্যাম চরিত্রে ছেলেই ভূমিকা রাখে। ঘাটুদ্বয় পায়ে নূপুর বেঁধে নাচ করে।

ওস্তাদ ও পাইল :

ঘাটুগান পরিবেশন করার ক্ষেত্রে একজন ওস্তাদ থাকেন, যিনি মূলত দলনেতা। আর তার সঙ্গে থাকে একাধিক দোহার বা পাইল। কয়েকজন দোহার কেবলমাত্র হাততালি দিয়ে ও অন্যান্য দোহারদের সাথে গানে অংশ নেয়। কয়েকজন দোহার একই সঙ্গে গান করেন ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার :

ঘাটু গান মূলত দলীয় গান। এ গানের বাদ্যযন্ত্র অতি সাধারণ। একটি ঢোল, খঞ্জুরী, মন্দিরা বা করতাল এবং একটি বাঁশের বাঁশিই যথেষ্ট। সময় বিশেষে কাঠের চটি কিংবা হারমোনিয়াম ব্যবহার করা হয়।

বাহার :

ঘাটুগানে বাহার খুবই আনন্দ দেয় দর্শকদের। বাদ্যযন্ত্রের তালের সাথে সাথে উচ্চস্বরে বাহার বিছুক্ষণের জন্য দর্শকদের মাতিয়ে তোলে। বাহারে অংশ নেয় দোহার বা পাইলেরা। যেমন: ওরে হে চাবুল বুল চাবুল/ হিয়ারে বেশ বেশ ।

ঘাটু গানের পোশাক-পরিচ্ছদ :

ঘাটু গানে রাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় আভিজাত্যপূর্ণ কাতান বা বেনারসী শাড়ী। শাড়ির নকশাও খুবই রঙিন হয়ে থাকে। শ্যাম ঐতিহ্যবাহী রাজা-বাদশাদের মখমলের কাপড়ের উপর নকশা করা পোশাক ব্যবহার করে। দু'জনেই প্রয়োজনে মুকুট ব্যবহার করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল শ্যাম মুকুট ব্যবহার করে।

ঘাটু গানের মঞ্চ :

ঘাটু গানের জন্যে কোনো মঞ্চ তৈরির প্রয়োজন হয় না। খোলা মাঠের কোনো জায়গায় পাটি পেতে ঘাটুদল বসে গান পরিবেশন করে। দর্শকরা গোল হয়ে বসে ও দাঁড়িয়ে ঘাটুগান উপভোগ করে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশনরীতি :

রাই চরিত্রের ঘাটু আসরে এসে প্রথমে ওস্তাদের সাথে করর্দন করার পর আসরের অন্যান্য দোহারদের সাথে করর্মদান শেষে বন্দনা গান পরিবেশন করে।

রাইয়ের বন্দনা :

"রাই : সেলাম জানাইলাম সবার বিদ্‌মান

দোহার : সেলাম জানাইলাম গো সবার বিদ্‌মান

রাই : সবার বিদ্‌মানটি গোলাম আমার বিদ্‌মান।

দোহার : ওরে হে ওরে ভাল হে

রাই : মুসলমান ভাইরে সেলাম, হিন্দু ভাইরে প্রণাম

দোহার : ওরে চাবল চাবল, ভাল হে-ভালরে।"[১]

রাই বন্দনা শেষে নিজের পরিচয়জ্ঞাপন মূলক গান পরিবেশন করে।

পরিচয়মূলক গান :

"রাই : শ্যাম বলি যে তোরে
যেদিন মায়ের গর্ভে ছিলে
সেইদিন খাইছস কী

দোহার : শ্যাম বলি যে তোরে
ওরে জানলে কথা বইল-অ আমারে
একটি কথা প্রশ্ন করি তোরে ॥

রাই : শ্যাম বলি যে তোরে
কোন দিঘিতে বইস্যা আর
শুইয়া ছিলে
শিথান দিছস কী ॥"[২]

রাই গানে গানে প্রশ্ন করে আসরে বসে যায়। প্রবেশ করবে শ্যাম। শ্যামও প্রথমে বন্দনা ও পরে পরিচয়মূলক গান পরিবেশন করার পর রাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়।

ঘাটুগানের পংক্তি সংখ্যা :

ঘাটুগান সাধারণত চার পংক্তি হয়ে থাকে। চার পংক্তির মধ্যেই মূলভাব ও সারকথা প্রকাশ পায়।

ঘাটুগানের শিল্পীবৃন্দ :

ঘাটুগানের শিল্পীরা সাধারণত খেটে খাওয়া মানুষ। নিত্য অভাব অনটনের মধ্যেও তারা ঘাটুগানের আনন্দ উপভোগ করে ও অন্যদেরও আনন্দদান করে।

ঘাটুগানের পরিবেশন সময় :

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঘাটুগান সাধারণত কার্তিক মাস থেকে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ঘাটুগানের দর্শক :

ঘাটুগানের দর্শক সাধারণ শ্রেণির মানুষ। খেটে খাওয়া মানুষ অবসর সময়টুকুতে আনন্দ উপভোগের জন্যই ঘাটুগানের আসরে উপস্থিত হয়।

পালাগান

"A ballad is a song that tells a story, or to take other point of view- a story told in song।"[৩] মধ্যযুগে ইউরোপে এক প্রকারের আখ্যানমূলক লোক-গীতি বহুল প্রসার লাভ করে, তাকেই সাধারণত বলা হয় Ballad। Ballad সাধারণত আখ্যানমূলক অর্থাৎ তাতে একটিমাত্র কাহিনি। এগুলি গীত হবার জন্যই রচিত হয়। লোক-কবির চিন্তাধারা, শব্দভাণ্ডার, প্রকাশভঙ্গিই Ballad এর বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজি Ballad কথাটি আমাদের দেশে গাথা বা গীতিকা নামে পরিচিত। দীনেশচন্দ্র সেন Ballad কে অভিহিত করেছেন 'গীতিকা' নামে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামগুলি দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত। আশুতোষ ভট্টাচার্যও গীতিকা বলে অভিহিত করেছেন ব্যালাডকে। সুকুমার সেন Ballad

Dhaka University Institutional Repository

কে অভিহিত করেছেন 'গাথা' বলে। নানাজনে গ্রন্থন করে বলেই সম্ভবত এটি 'গাথা' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। সংস্কৃত ও পরবর্তী প্রাকৃত সাহিত্যে গাথা বলতে আখ্যানমূলক গীতি কবিতাকেই বোঝাত। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গীতিকা বা গাথার উদ্ভব হয়েছে। গাইবার জন্য রচিত হতো বলে গাথার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো সুরপ্রধান কাহিনি বর্ণনা। গাথা বলতে সাধারণত একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্যক্তিনিরপেক্ষ গীতিময় কাহিনিকে বোঝায়।

গীতিকার সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য :

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন - "গীতিকা সর্বত্রই গীত হয়, কোথাও আবৃত্তি করা হয় না।"[৪] গীতিকা মৌখিক রচনা, লোকগীতির মতোই তা গীত হবার জন্য রচিত হয়েছে। প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা স্বল্পায়তন বিশিষ্ট, মানুষ একবার কিংবা দু'একবার শুনলেই স্মৃতিতে তা ধরে রাখতে পারে। কিন্তু গীতিকার মতো দীর্ঘাকৃতির রচনা সুর সংযোগে গীত না হলে কখনই তা স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব হতো না। সুরই এক্ষেত্রে গীতিকার মতো দীর্ঘাকৃতির রচনাকে স্মৃতিতে ধরে রাখার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। গীতিকাগুলি কখনই নিছক আবৃত্তি বা পাঠের জন্য রচিত হয়নি। সুর সংযোগে গীত না হলে গীতিকার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। সংগীত রূপে ব্যবহারের জন্য রচিত বলেই গীতিকাগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি চরণ সম্বলিত। অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় আমাদের গীতিকার চরণগুলিতে মাত্রা সমতা রক্ষিত হয়নি। পাঠের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে, তাল ভঙ্গ করে। কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে তা হয়না, সুরকে হ্রস্ব, দীর্ঘ করে মাত্রার অসম্পূর্ণতা দূর করা হয়। গীতিকায় ব্যবহৃত ধুয়াও সংগীতরূপে এগুলির ব্যবহৃত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ।

গীতিকার ছন্দ :

গীতিকার ছন্দ সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন-

> "গীতিকামাত্রই প্রচলিত রচনারীতির অনুগামী; ছড়ার বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন আকস্মিকতা ও অভিনবত্ব অনেক সময় চোখে পড়ে, তেমনি ছন্দের দিক দিয়েও অনেক সময় নূতনত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু গীতিকার রচনা-রীতিতে কোন বৈচিত্র্য নেই। এই ছন্দে তা আনুপূর্বিক রচিত হয়ে থাকে। কেবল মাত্র একটি গীতিকাই যে আনুপূর্বিক আভিন্ন ছন্দে রচিত হয় , তা নয়- এটা রচনার দ্বিতীয় আর কোন ছন্দই নেই; একই পরিচিত ছন্দ তার সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।"[৫]

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলতে চেয়েছেন গীতিকাগুলি আনুপূর্বিক ছড়ার ছন্দে আর্থাৎ ৪+৪+৪+২ এই মাত্রা সীমায় রচিত। অবশ্য তিনি আরো বলেছেন -

"ক্বচিৎ কোন গীতিকায় মধ্য বাংলার অন্য কোন রচনার প্রভাববশত: চার মাত্রার পর্বকে ছয় মাত্রা কিংবা আট মাত্রার পর্বে বদ্ধিত করে নেয়া হয়, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নয়।"[৬]

কিন্তু গীতিাকগুলি আনুপূর্বিক বৈচিত্র্যহীন, ছড়ার ছন্দে রচিত তা নয়। নিম্নে বিভিন্ন গীতিকার অংশ বিশেষ উল্লেখ করে সেগুলির ছন্দোনির্মিত কৌশল তুলেধরা হলো-

"। । । । । । । । । । । । । । ।
নাগরিয়া সবে মিলে I চক্রান্ত করি সকলে I ৮+৮
। । । । । । । । । ।
ছল করি কঙ্কে দেখাইল I ১০
। । । । । । । । । । । । । । ।
বুঝিতে পারিয়া তবে I ডাকাইয়া শিষ্য সবে I ৮+৮
। । । । । । । । । ।
কঙ্কেরে আনিতে যুক্তি দিল I ১০ (কঙ্ক ও লীলা)"[৭]

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে অক্ষরবৃত্তে 'বিজোড়ে বিজোড় গাথ, জোড়ে গাথ জোড়', রীতির অনুসরণ 'চক্রান্ত করি সকলে' হয়নি। তারই প্রমাণ 'চক্রান্ত' এই তিন মাত্রার শব্দটির পরে ব্যবহৃত হয়েছে 'করি' এই জোড়া মাত্রার শব্দটি।

"। । । । । । । । । । । । । ।
কহিলা রাজার পুত্র I মনেতে ভাবিয়া I ৮+৬
। । । । । । । । । । । । । । ।
কলীপূজা করে বাপে I নরবলি দিয়া I ৮+৬ (কমলা)"[৮]

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতিটি চরণের প্রথম পর্ব আট মাত্রা বিশিষ্ট, অপরপক্ষে দ্বিতীয় পর্বটি ছয় মাত্রার।

"। । । । । । । । । । । । ।
এদিকে হইল কিবা I শুন দিয়া মন I ৮+৬
। । । । । । । । । । । । । ।
দুষ্মনি করিল যত I জ্ঞাতি বন্ধুগণ I ৮+৬ (মলুয়া)"[৯]

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পর্বটি আট মাত্রায় এবং দ্বিতীয় পর্বটি ছয় মাত্রায়।

"। । । । । । । । । । । । । । । ।
কাইন্দ না I কাইন্দ না I কন্যারে না I কান্দিয়ো আর I ৪+৪+৪+৪
। । । । । । । । । । । । ।
নিশি রাইতে I কইবাম কন্যা I তোমার সমা I চার I ৪+৪+৪+১ (কাজলরেখা)"[১০]

Dhaka University Institutional Repository

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে রচিত। প্রতিটি পর্ব চার মাত্রার।

তাছাড়া সমপদী তালের ছন্দের পাশাপাশি অসমপদী ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে গীতিকায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় মাধবের প্রতি সোনাইয়ের ভালোবাসা বর্ণিত হয়েছে তেওড়া তালের ছন্দে। যেমন: নিম্নে গানের উল্লেখ সহ, তাল বর্ণনা ও স্বরলিপি তুলে ধরা হলো -

"উইড়া উইড়া আসে ভ্রোমর
ঘুইরা ঘুইরা চলে
ধরতে যদি পারতাম ভ্রোমর
রাইতের নিশা কালে
খাইতে দিতাম ফুলের মধু
বইতে দিতাম পিড়ী
শুইতে দিতাম শীতল পাটি
সঙ্গে যাইতাম উড়ি ॥"[১১]

(দেওয়ান-ভাবনা, মৈমনসিংহ গীতিকা)

তাল: তেওড়া

মাত্রা সংখ্যা ৭। এই তালে মোট তিনটি বিভাগ। যথাক্রমে ৩/২/২ ছন্দে বিভক্ত। এটি একটি অসমপদী তাল। তিনটি বিভাগে কোনো খালি নেই। প্রথম মাত্রায় সোম, চর্তুথ মাত্রায় ২য় এবং ষষ্ঠ মাত্রায় ৩য় তালি। তেওড়া ধ্রুপদাঙ্গীয় তাল হলেও, বাংলা লোকসংগীতে এর ব্যবহার রয়েছে।

তবলার বোল :

+				২			৩			+
ধা	ধি	না	।	ধি	না	।	ধি	না	।	ধা
১	২	৩	।	৪	৫	।	৬	৭	।	১

Dhaka University Institutional Repository

স্বরলিপিঃ

(+)				(২)			(৩)		
১	২	৩	।	৪	৫	।	৬	৭	
সা	ধা্	সা	।	সা	া	।	া	রা	**I**
উই	ড়া	০		উ	ই		ড়া	০	
রা	গা	মগা	।	রা	সা	।	সা	রা	**I**
আ	সে	০		ভ্রো	০		ম	র	
রা	গা	মগা	।	রা	সা	।	সা	রা	**I**
ঘুই	রা	০		ঘু	ই		রা	০	
রা	গা	া	।	গা	মগা	।	রা	সা	**I**
চ	লে	০		০	০		০	০	
ধা	ধা	ণা	।	ধা	পা	।	া	া	**I**
ধর	তে	০		য	০		দি	০	
পা	মা	পা	।	মা	গা	।	গা	রা	**I**
পার	তা	ম		ভ্রো	০		ম	র	
রা	গা	মগা	।	রা	সা	।	সা	রা	**I**
রাই	তে	র		নি	০		শা	০	
রা	গা	গা	।	গা	মগা	।	রা	সা	**I**
কা	লে	০		০	০		০	০	

রা	গা	মগা	।	রা	সা	।	সা	রা	**I**
রাই	তে	র		নি	০		শা	০	

রা	সা	া	।	া	া	।	া	া	**I**
কা	লে	০		০	০		০	০	

সা	ধা্	সা	।	সা	া	।	া	রা	**I**
খাই	তে	০		দি	০		তা	ম	

রা	গা	মগা	।	রা	সা	।	সা	রা	**I**
ফু	লে	ও		ম	০		ধু	০	

রা	গা	মগা	।	রা	সা	।	সা	রা	**I**
বই	তে	০		দি	০		তা	ম	

রা	গা	া	।	গা	মগা	।	রা	সা	**I**
পি	ড়ী	০		০	০		০	০	

ধা	ধা	ণা	।	ধা	পা	।	া	া	**I**
শুই	তে	০		দি	০		তা	ম	

পা	মা	পা	।	মা	গা	।	গা	রা	**I**
শী	ত	ল		পা	০		টি	০	

রা	গা	মগা	।	রা	সা	।	সা	রা	**I**
স	ঙ্গে	০		যা	ই		তা	ম	

Dhaka University Institutional Repository

রা	গা	গা	।	গা	মগা	।	রা	সা	**I**
উ	ড়ি	০		০	০		০	০	
রা	গা	মগা	।	রা	সা	।	সা	রা	**I**
স	ঙ্গে	০		যা	ই		তা	ম	
রা	সা	া	।	া	া	।	া	া	**I I**
উ	ড়ি	০		০	০		০	০	

গীতিকার সুর :

প্রতিটি পর্যায়ের লোকসংগীত যেমন নির্দিষ্ট সুরে গীত হতে শোনা যায়, কোন ক্ষেত্রেই সুর বিকৃতি ঘটানোর অধিকার কারো নেই, তেমনি গীতিকাগুলির ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। গীতিকাগুলি নির্দিষ্ট সুরে গীত হবার প্রথা। মূলত গীতিকাগুলি পয়ার ছন্দে রচিত এবং রামায়ণ গায়ক যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুরে তা পাঠ করেন, গীতিকাগুলিও সেই পাঁচালী সুরে গীত হয়। গীতিকা গীত হবার সময় ব্যবহৃত হয় বেহালা, সারিন্দা, দোতারা, ঢাক, ঢোল, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। বলা হয় লোকসংগীতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ভাটিয়ালি। ভাটিয়ালি একান্তভাবেই পূর্ববঙ্গের প্রচলিত লোকসংগীত। মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে ভাটিয়ালির রাজকীয় আধিপত্য। ভাটিয়ালি গানের প্রতিটি ধাঁচে চারটি করে লহর বিদ্যমান। লহর 'টান্' নামেও পরিচিত। লহর চারটি হল- ফেরুসাই, ঝাঁপ, সারি, বিচ্ছেদ। ভাটিয়ালির বিচ্ছেদ লহর ব্যবহৃত হয় করুণ রসাত্মক গানে। অপরপক্ষে হাস্যরসাত্মক গান গীত হয় সারি লহরে। ঝাঁপ লহরে নানা রসের গান পরিবেশিত হতে পারে। তবে সচরাচর করুণ রস পরিবেশনে মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার কারণে ঝাঁপ লহরে করুণ রসাত্মক পালার অন্তিম গানগুলি গীত হয়না। বিচ্ছেদ, সারি ও ঝাঁপ ব্যতীত ভাটিয়ালি সুরের অন্য সব ফেরুসাই লহরের অন্তর্ভুক্ত। মৈমনসিংহ গীতিকায় ' দেওয়ান-ভাবনা' পালাটি ভাটিয়ালি সুরে গীত। এই পালায় মাধব এর কোন কোন মনোভাব গীত হয় ভাটিয়ালি সুরে। নিম্নে তেমন একটি গানের উদাহরণসহ স্বরলিপি তুলে ধরা হলো -

"কেবা যাওরে নদী দিয়া

বাইয়া পানশি নাও ---

কার ঘরের যুবতী নারী

ধইরা লইয়া যাও

কীসের লাগিয়া কাঁন্দ

পানসীতে বসিয়া

তোমারে না উদ্ধার করবাম

এই না বাহু দিয়া ॥"[১২]

(ভাটিয়ালি সুর, মৈমনসিংহ-গীতিকার অন্তর্গত 'দেওয়ান ভাবনা' পালা)

স্বরলিপি :

(+)					(০)				
১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮	
গা	রা	গা	পা	।	ধা	র্সা	া	া	**I**
কে	বা	যাও	রে		ন	দী	দি	য়া	
র্সা	র্রা	র্গা	র্রা	।	র্গা	া	া	া	**I**
বাই	য়া	পান	সী		না	০	০	০	
র্মা	র্গা	র্রা	া	।	র্রা	া	া	া	**I**
০	০	০	ও		০	০	০	০	
র্রা	র্মা	র্গা	র্রা	।	র্সা	নধা	ধা	নধপা	**I**
কার	ঘ	রের	যু		ব	তী	না	রী	
পা	ধা	না	না	।	র্সা	া	া	া	**I**
ধই	রা	লই	য়া		যা	০	০	ও	

গা	রা	গা	পা	।	ধা	র্সা	া	া	**I**
কী	সে	র	লা		গি	য়া	কা	ন্দ	
র্সা	র্রা	র্গা	র্রা	।	র্গা	া	া	া	**I**
পান	সী	তে	ব		সি	য়া	০	০	
র্মা	র্গা	র্রা	া	।	র্রা	া	া	া	**I**
০	০	০	০		০	০	০	০	
র্রা	র্মা	র্গা	র্রা	।	র্সা	নধা	ধা	নধপা	**I**
তো	মা	রে	না		উ	দ্ধার	কর	বাম	
পা	ধা	না	না	।	র্সা	া	া	া	**I**
এই	না	বা	হু		দি	য়া	০	০	

<u>গীতিকার ধুয়া</u> :

বাংলায় 'ধুয়া' শব্দটি এসেছে 'ধ্রুব' শব্দ থেকে। ধুয়া হল গানের এমন একটি পদ যা দোহারগণ বারবার গানের মাঝে গেয়ে থাকেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ধোয়া সম্পর্কে বলেছেন -

> "ধুয়ার পদ সাধারণত: একটিমাত্র হইয়া থাকে, ইহার অধিক হয়না, ইহা অনেক সময় গীত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্রও হইয়া থাকে।"[১৩]

তিনি আরও বলেছেন -

> "গীতিকায় যে ধুয়া ব্যবহিত হইত, তাহার সঙ্গে কাহিনীর বিষয়বস্তুর কোন যোগ থাকিতনা। সেই জন্যই একই ধুয়া বিভিন্ন গীতিতে এবং বিভিন্ন গীতিকার বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত হইতে পারিত। সমগ্র মৈমনসিংহ গীতিকায় বিভিন্ন পালাতেই প্রায় একটি অভিন্ন ধুয়া শুনিতে পাওয়া যায়।"[১৪]

গীতিকায় ধুয়া ব্যবহৃত হয় নানা উদ্দেশ্যে। প্রথমত; গীতিকায় বর্ণিত কাহিনীর পরিবেশকে সমৃদ্ধ করতে ধুযার ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়ত; গীতিকার গল্পরসকে সমৃদ্ধ করতেও ধুয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৃতীয়ত; আপাত অসংলগ্ন বলে

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচিত যে ধুয়া তা বিশ্রামের কাজ করে। চতুর্থত; একটানা কাহিনী পরিবেশিত হলে সেখানে শ্রোতার আকর্ষণ হ্রাস পাবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ধুয়ার ব্যবহারে কাহিনীর ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আকর্ষণ তথা কৌতুহল বৃদ্ধি পায় বা তা অটুট থাকে। পঞ্চমত; ক্ষেত্রবিশেষে গীতিকায় পরিবেশিত কাহিনীর যে মেজাজ, ধুয়াকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেজাজের করে রচনা ও ব্যবহার করায় গীতিকায় একপ্রকার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।

গীতিকায় ধুয়ার ব্যবহারগত বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ধুয়া ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোন রীতি নেই। তবে সচরাচর প্রতিটি স্তবকের শেষে তা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আবার কখনও কখনও স্তবকের মধ্যেও ধুয়ার ব্যবহার লক্ষিত হয়। মৈমনসিংহ গীতিকার কম বেশি সব পালাতেই ধুয়ার ব্যবহার লক্ষণীয়। 'মহুয়া' পালাতে ধুয়ার ব্যবহার যেমন অধিক, তেমনিই প্রয়োগগত বৈচিত্র্যও সহজেই সচেতন পাঠককে আকৃষ্ট করে। গারো পাহাড়-বন প্রদেশে হুমরার সদলবলে উপস্থিত হয়ে তার ভাইকে বিদেশে খেলা দেখাবার প্রস্তাব দান প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে -

"হুমড়া বাইদ্যাকে ডাক দিয়া কয় মাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।

পুনরায় মহুয়ার আত্মঘাতিনী হবার পর দেশে ফিরে যাবার প্রস্তাব সহ হুমরা তার ভাইকে একই ভাষায় বলেছে -

হুমড়া বাইদ্যাকে ডাক দিয়া কয় মাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।"[১৫]

জারিগান

ময়মনসিংহ অঞ্চলের জারি গান বাংলা লোকসংগীতের ধারায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। জারি গান খোলা স্থানে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে গাইতে দেখা যায়। সাধারণত বয়াতি দাঁড়িয়ে থাকে তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে গায়কদল বসে থাকে। বয়াতী আসরে সমবেত বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের দর্শকশ্রোতাগণকে সালাম-আদাব জানিয়ে মূল কাহিনী শুরু করেন। সুরেলা কণ্ঠে উচ্চারিত জারিগানের সঙ্গে জারিয়ালরা সুর মিলিয়ে গায়। মুখে মুখে রচিত হলেও জারিগানের এমন কিছু অংশ আছে যার মৌলিক পরিবর্তন বিশেষ একটা হয় না।

অন্যান্য লোকসংগীতের মতো জারিগানেও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মূল উপকরণ হচ্ছে নেপুর (নূপুর), এছাড়া ঢোল, হারমোনিয়াম, জুড়িও ব্যবহার করা হয়। জারি বয়াতি ধূতি পরিধান করেন, তবে বর্তমানে পাজামা-পাঞ্জাবি, লুঙ্গিও ব্যবহার হয়ে থাকে। উপরে গেঞ্জি বা শার্ট। তবে প্রত্যেকের হাতে একই রঙের রুমাল থাকে। সাধারণত লাল রঙের রুমাল থাকে।

'জারিগান' শুরু হবার সময় বয়াতি ব্যতীত সকলেই অর্ধবৃত্তাকারে উপবেশন করে। আসরে বয়াতি সবাইকে চারদিক ঘুরে ঘুরে সালাম কিংবা করজোড় করে প্রণাম জানান। এরপর সৃষ্টিকর্তার বন্দনামূলক

গান শুরু করে। বয়াতি কখনো বৃত্তের বাইরে, কখনো ভিতর থেকে ঘুরে ঘুরে গাইতে থাকে। বয়াতি যখন গাইতে থাকে তখন মাতাইমারা তাকে অনুসরণ করে হাতে তালি দিয়ে, হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্য ও মাঝে মাঝে তাল মিলিয়ে সুর সংযোগে ছোট ছোট কথা যেমন-আহা ভাই, বেশ ভাই, ভালো ভাই ইত্যাদি বলতে থাকে। জারিয়াল দলের নৃত্য বিচিত্র এবং অত্যন্ত উপভোগ্য। দিশা যেমন খাড়া লম্বা, নাচেও তেমনি পটো হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের জারি গানের বয়াতির কলাকৌশলপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গি যেমন আকর্ষণীয়, তেমনী চিত্তাকর্ষক এবং উপভোগ্য জারিয়ালদের নৃত্য বৈচিত্র্য। নিম্নে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঈশ্বরগঞ্জ জেলার জারি গানের অংশবিশেষ তুলে ধার হলো -

ঈশ্বরগঞ্জের জারিগান :

'*বিষাদসিন্ধু*'-এর কাহিনি ও শহীদে কারবালা পুঁথির কাহিনি থেকে কারবালার জারি পরিবেশন করা হয় ঈশ্বরগঞ্জ এলাকায়। জারি পরিবেশনকালে বয়াতি লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পড়েন, তবে কোনো কোনো সময় পাঞ্জাবির সাথে পাজামাও পরা হয়। দোহাররা লুঙ্গি ও হাফ হাতা কোরা গেঞ্জি পড়েন। সবার হাতে থাকে বিভিন্ন রঙের ও নকশার রুমাল। পায়ে নূপুর। বিভিন্ন ধরনের যতসব ভঙ্গি দেখায় দোহাররা। ডায়না কখনো সুর ধরে গায়-'কই গেলে রে পুলাপান'। আর দোহাররা একসঙ্গে সুর করে গেয়ে উঠে-'বদনি লইয়া পানি আন', ডায়না ও দোহারদের এই ধরনের ভূমিকা হলো দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়া এবং বয়াতি'কে কিছুটা সময় দম নেওয়ার জন্যে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে ঈশ্বরগঞ্জের জারি গানে শহীদ কারবালার বন্দনা -

শহীদ কারবালার বন্দনা

"আল্লাহ নামটি না হয় জেনো ভুল
ভুল হইলে মন পড়বি ফেরে হারাইবি দুই কূল
সদাই জপি নবীর নামগো নবী পারের মূল
দয়া কইরা উম্মত নবী কইরা নাও কবুল ॥"[১৬]

মহররমের চাঁদ বন্দনা

মহররমের চাঁদ আকাশে উঠিল
ঐ চাঁদেরই দশ তারিখে মায়ের বুকে শেল দিলো ॥
ছয় হাজার লোক নিয়া সাথে যাইতেছিল কুফার পথে
পথ ভুলে গেল কারবালাতে হায়রে দুঃখ ঘটিল ॥
সখিনার বিয়ার দিনে আবুল কাশেম যায়গো রনে
দুঃখ রইল এই দুজনে আশা নাহি ফুরাইল ॥

[জারি গান, শ্রুতঃ হেলিম ময়াতি, তারিখঃ ১-৩ নভেম্বর ২০১৬]

তাল: দাদরা

মাত্রা সংখ্যা ৬ । বিভাগ দুটি। যথাক্রমে ৩/৩ ছন্দে বিভক্ত। এটি একটি সমপদী তাল। একটি তালি এবং একটি খালি। প্রথম মাত্রায় সোম এবং চতুর্থ মাত্রায় খালি। বাউল গানে দাদরা তালের ব্যবহার অধিক।

তবলার বোল :

+				০			+
ধা	ধি	না	।	না	তি	না।	ধা
১	২	৩	।	৪	৫	৬।	১

স্বরলিপি :

	(+)				(০)		
	১	২	৩	।	৪	৫	৬	
	পা	পা	না	।	ধা	না	না	**I**
	ম	০	হর		র	মে	র	

Dhaka University Institutional Repository

পা	া	ধা	।	পা	মা	গা	**I**
চাঁ	দ	আ		কা	শে	০	

পা	া	া	।	না	ধা	না	**I**
উ	ঠি	০		ল	০	০	

ধা	পা	া	।	া	া	া	**I I**
০	০	০		০	০	০	

র্সা	া	া	।	া	া	া	**I**
ঐ	০	চাঁ		দে	রি	০	

র্রা	র্রা	র্গা	।	র্রা	র্সা	র্না	**I**
দ	শ	তা		রি	খে	০	

না	না	র্সা	।	না	ধা	পা	**I**
মা	য়ে	র		বু	কে	০	

পা	পা	ধা	।	না	া	া	**I I**
শে	ল	দি		ল	০	০	

গা	গা	গা	।	গা	পা	পা	**I**
ছ	য়	হা		জার	লোক	০	

পা	ধা	ধা	।	ধা	না	না	**I**
নি	য়া	০		সা	থে	০	

পা	পা	না	।	ধা	না	না	**I**
যা	ই	তে		ছি	ল	০	

পা	ধা	ধা	।	পা	পা	পা	**I**
কু	ফা	র		প	থে	০	

র্সা	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	র্সা	**I**
প	থ	ভু		লে	গে	ল	

র্রা	র্রা	র্গা	।	র্রা	র্সা	না	**I**
কা	র	বা		লা	তে	০	

না	না	র্সা	।	না	ধা	পা	**I**
হা	য়	রে		দুঃ	খ	০	

পা	পা	ধা	।	না	া	া	**I I**
ঘ	টি	০		ল	০	০	

গা	গা	গা	।	গা	পা	পা	**I**
স	খি	০		না	র	০	

পা	ধা	ধা	।	ধা	না	না	**I**
বি	য়া	র		দি	নে	০	

পা	পা	না	।	ধা	না	না	**I**
আ	বু	ল		কা	শে	ম	
পা	ধা	ধা	।	পা	পা	পা	**I**
যা	য়	গো		র	নে	০	
র্সা	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	র্সা	**I**
দুঃ	০	খ		রই	ল	০	
র্রা	র্রা	র্গা	।	র্রা	র্সা	না	**I**
এ	ই	দু		জ	নে	০	
না	না	র্সা	।	না	ধা	পা	**I**
আ	শা	০		না	হি	০	
পা	পা	ধা	।	না	া	া	**I I**
ফু	রা	ই		ল	০	০	

সারি গান

ময়মনসিংহ অঞ্চলে নৌকা বাইচে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা নৌকা চালানোর সময় নিজেদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য সারি গান গেয়ে থাকে। নৌকায় ঢোল, করতাল, কাঁশী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহ এসব গান পরিবেশিত হয়। সারি গানে বয়াতী দিশা ধরিয়ে দিয়ে ইচ্ছামত মিলিয়ে মিলিয়ে গান তৈরি করে থাকেন। তাই দেখা যায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের সারি গানে অনেক পালাগান, ঘাটুগান, জারীগান, বাউলগান সন্নিবেশিত হয়ে যায়। নৌকা বাইচে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে বয়াতীগণ রংবেরং গান তৈরী করে থাকেন। তবে এ অঞ্চলের সারি গানে নর-নারীর প্রেম, রাধা-কৃষ্ণ, প্রশংসামূলক গান, হরগৌরী ও

Dhaka University Institutional Repository

নিমাই বিষয়ক গান, মরমি গান, হাস্যকৌতুক ও আক্রমণাত্মক গান সহ নানা বিষয় স্থান পেয়েছে। সারিগানে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়। যেমন ঘাট থেকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর সময় বয়াতী গাইছে -

"কালি দরে যাবো আমি ওমা নন্দরানী

কালি দরে যাবো আমি-

নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, বয়াতী তখন গাইছে -

মাগো কালিদর সাগরের পানি নাগের বিষে কালা

সেই না নাগ মাইরা দূর করবাম বিষের জ্বালা ॥"[১৭]

এই ভাবে বয়াতী গান তৈরী করে আর বাইচালগণ তালে তালে বৈঠা ফেলে দিশা ধরে। নৌকার মাঝখানে তক্তার উপর দাঁড়ানো বাদকদল বাদ্য বাজায়। আর বাইচের মোড়লগণ এক পা সামনে এক পা পেছনে ফেলে দুলতি তালে গানের সাথে নৃত্য করে।

সারি গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া ঐতিহ্যবাহী গান। ময়মনসিংহ অঞ্চলের আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস অবধি এ গান গাওয়া হয়। বিশেষ কোন দিনে 'নৌকা দৌড়' প্রতিযোগীতায় নৌকা চালকরা সম্মিলিত কণ্ঠে এই গান গেয়ে থাকেন। এটি নৌকা দৌড় প্রতিযোগীতার প্রাণ স্পন্দন। এই গানের সুর, তাল ও লয় প্রতিযোগীদের মনে অশেষ উৎসাহ যোগায় যা তাদেরকে জয়ী করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উৎসব আর গান এ দুয়ের এক অপূর্ব মিত্রতা দেখা যায় ময়মনসিংহের নৌকা বাইচে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্থানীয় ভাষায় দৌড়ের নৌকাকে বলা হয় 'দৌড়ের নাও', যারা বৈঠা বায় তাদেরকে বলা হয় 'বাইচাল', নৌকার দু'কিনারকে বলা হয় 'বাতা' এবং তাদের গাওয়া গানকে বলা হয় 'হাইর'। যে স্থানে নৌকা দৌড় অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় 'আরঙ্গ'। সাজানো গোছানো দৌড়ের নাওয়ের সৌন্দর্য এবং তার বাইচালদেও বিচিত্র সুর, একই সাথে একই নৌকার বাইচালদের একই তালে বৈঠা চালানো, পানির ছপাছপ আওয়াজ অগত দর্শকের প্রাণে এক অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি করে।

গাজীর গান

গাজীর জীবনভিত্তিক আখ্যান কাব্যের মুদ্রিত পুঁথির নাম 'গাজীকালু চম্পাবতী'। রচয়িতা পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের গলাচিপা গ্রামের শেখ আব্দুর রহিম। শেখ আব্দুর রহিম কৃত 'গাজীকালু চম্পাবতী' পুঁথিকে কবি স্বয়ং 'গাজীর গীত', 'পয়ার পাঁচালি' নামে অভিহিত করেছেন। কাব্যটির সর্বত্র 'ধুয়ার' ব্যবহার লক্ষনীয়। তাছাড়া গাজীরগানের গল্পের প্রসঙ্গ স্থলে, তাৎক্ষনিক মন্তব্য ও নানা উদ্ভট ব্যাখ্যা দ্বারা হাস্যরস সৃজন দোহারের কাজ। দোহার হাস্যরস সৃষ্টিতে দক্ষ হলে নাট্য আসর জমজমাট হয়ে উঠে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের গাজির গানে গায়েন একা একাই সমগ্র পরিবেশনা করেন। এ অঞ্চলে গাজির গানে পুরুষকে ছুকরি সাজাতে দেখা যায়, তিনিই ছুকরি সেজে নৃত্যগীত করে থাকেন, পাশাপাশি চলে গদ্য, সংলাপের আকারে বর্ণনা। এ সময় তার পেছনে বসা বাদ্যকাররা বাদ্যবাদন ও দোহারকি করতে দেখা যায়। অনেক সময় তারাও দু-একটি গান গেয়ে থাকেন। গায়েনরা ঘাগরা আর উপরে রঙ্গিন শার্ট পরেন। গলায়তসবির মালা, কপালে লাল কাপড়, হাতে গামছা, কোমরে গামছা, পায়ে ঘুঙুর, একহাতে চামর, আরেক হাতে থাকে পাখা, মুখে রঙ্গিন সাজসজ্জা থাকে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল থাকে। বাদ্যকারদের পোশাক সাধারণ থাকে। লুঙ্গি, গেঞ্জি বা শার্ট পরনে থাকে। এই গান করতে তারা ঢুলি, হারমোনিয়াম, জুড়ি/করতাল, চাঁ বাদ্য ব্যবহার করেন। নিম্নে ময়মনসিংহের গৌরীপুর এবং হালুয়া ঘাট অঞ্চলের গাজীর গানের অংশবিশেষ বর্ণিত হলো -

গৌরীপুরের গাজীর গান :

গৌরীপুর অঞ্চলে গাজীর গান মানত হিসেবে আদায় অনুষ্ঠান-এর রীতি অন্যান্য অঞ্চল চাইতে কিছুট ভিন্ন প্রকৃতির। আর এ অঞ্চলে গাজীর গান পরিবেশন করে থাকেন শামীম বয়াতি ও তাঁর দল। শামীম বয়াতি মূলত কিস্‌সা গায়ক। কিস্‌সা ছাড়াও 'গাজীর গান'-এর আসরে গেয়ে থাকেন। এখানকার গাজীর গান পরিবেশনায় রয়েছে বেশ কয়েকটি পর্ব।

প্রথম পর্ব :

বয়াতি তার দোহারদের নিয়ে মঞ্চের মাঝখানে গাজীর আশা বসিয়ে আসন পেতে বসেন। আশার সমনে থাকে ভাত খাওয়ার প্লেট এক মুষ্টি চাউল। আশার পাশে থাকে দুটি জলচৌকি। একটিতে রাখা হয় কুলা, অন্যটিতে রাখা হয় পাঁচটা মোম, আগরবাতি। এক গ্লাস জল ও ছোট পাত্রে সামান্য সরিষার তেল।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পর্ব :

যে ব্যক্তি মানতকারী তিনি তাঁর ঘরে বা ঘরের বারান্দায় বা আসনের কাছাকাছি বসেন। পাঁচজন মহিলা মানতের কিছু উপকরণ একটি কুলার মধ্যে সাজায়। তার মধ্যে থাকবে-পাঁচটি কলা, পাঁচটি হাঁসের ডিম, দেড় গজ লাল সালু কাপড়, মোম, আগরবাতি, গোলাপজল, পাঁচপোয়া চাউল। কুলার এসব উপকরণ সাজানোর পর পাঁচজন মহিলা মানতকারীর মাথায় তুলে দেন।

তৃতীয় পর্ব :

মানতকারী মঞ্চে আসে। বয়াতি মানতকারীর মাথা থেকে কুলা নামায় এবং মঞ্চসহ মঞ্চের আশেপাশে গোলাপজল ছিটায়।

চতুর্থ পর্ব :

বয়াতি আসরে বসে বন্দনা গাঢ। সঙ্গে সঙ্গত দেয় দোহাররা। দোহাররাই যন্ত্রীর ভূমিকা পালন করেন।

পঞ্চম পর্ব :

বন্দনা শেষ করে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ায় বয়াতি। দাঁড়িয়ে দোহারদের সঙ্গে নিয়ে পরিবেশন করবেন লাচার।

ষষ্ঠ পর্ব (গাজীর গান শুরুর ভনিতা) :

গাজীর গান শুরুর আগে বয়াতি গাজীর ভনিতাযুক্ত গান পরিবেশন করেন। গান শেষ করে বয়াতি বর্ণনার রীতি ব্যবহার করেন। ভাই সকল গাজী কালু জিন্দাপীর। তার নামে আজকের মানত। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনেন। তিরস্কার করবেন না।

সপ্তম পর্ব (মূল পালা শুরু) :

গাজীকালুর মূল পালা শুরু হয় গানের মধ্য দিয়ে। কখনও কখনও বর্ণনারীতিতে কাহিনি এগিয়ে চলে। কাহিনির বর্ণনার পাশাপাশি চলে বভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি। নাটকীয়ভাব, নৃত্য, কখনও সংশয়, কখনও-বা দিশা।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পর্ব (শিন্নি পর্ব) :

গাজী কালুর কাহিনি এমন এক পর্যায়ে আসে যখন গাজী কালু ভিক্ষাপাত্র হতে বেরিয়ে পড়েন মানুষের কাছে। এই পর্যায়ে শিন্নি পর্বটি শেষ হয়। গানে শিন্নি পর্বটি চলে। একমুষ্টি চাউলসহ প্লেটটি হাতে নিয়ে শিন্নির জন্যে গানটি গাওয়া হয়। শিন্নি পর্বটি গানে গানে শেষ হয়। এই পর্বে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ টাকা দান করে শিন্নি পর্বে অংশগ্রহণ করেন। শিন্নি পর্বের গান শেষ করে গাজী কালুর বাকি কাহিনিও গানে ও বর্ণনারীতিতে এগিয়ে চলে। কাহিনির শেষ পর্যায়ের আগে আরও একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

নবম পর্ব :

গাজী কালুর কাহিনি শেষ করার পূর্বে আসনের কাছে মানতকারীকে আনা হয়। বয়াতি আশা হাতে নিয়ে মানতকারীর গায়ে ছোঁয়াবে এবং ঝাড়াফুঁক দেবে। গ্লাসের পানিটা মূলত উদার পানি। পড়া পানি কিছুটা মানতকারীকে খাওয়াবে এবং কিছুটা দিয়ে দিনে গোসল করার সময় গায়ে ঢালার জন্যে। আর পাত্রের তেলটাও পড়া শেষে মানতকারীর হাতে তুলে দিবে-যা বাড়িতে গিয়ে গায়ে মাখাতে হবে। এই পর্যায়েই আবার নতুন মানতকারী আসবেন। নতুন মানতকারী এক-টুকরা সুতা হাতে নিয়ে আশার মধ্যে গিট দিয়ে তার বাসনার কথা ব্যক্ত করে চলে যাবেন। মানতকারীর মধ্যে বেশিরভাগই আসেন সন্তান কামনার জন্যে। গাজী পীরের উছিলায় আরও সমস্যা সামাধান হয়ে যায় সেজন্যও মানত করা হয়।

মানতকারীর বক্তব্য :

আল্লাহ রাসুলের রহমতে গাজী কালু বাবার উছিলায় আমার যদি সন্তান হয় তাহলে গাজী কালু পালা গাওয়াইয়ান। মানতকারী আসরে সালাম দিয়ে চলে যাবে। এইভাবে আরও একটি পালা ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

শেষ পর্ব :

গাজী কালু চম্পাবতীর কিস্‌সা বা পালার সমাপ্তি অংশ গান ও বর্ণনারীতিতে শেষ করা হয়।

হালুয়া ঘাটের গাজীর গান :

গাজী কালু, চম্পাবতীর কাহিনি ময়মনসিংহের হালুয়া ঘাটে স্থানীয়ভাবে যা 'গাজীর গান' নামে পরিচিত। এ অঞ্চলে গ্রামের অনেক বিশ্বাসী জনগণ গাজীর নামে 'মানত' রাখে বা গাজীর দলকে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায় কোনো রোগ থেকে আরোগ্যলাভ করতে। তাঁদের বিশ্বাস গাজীর নাম স্মরণ করলে রোগমুক্তি মেলে।

পরিবেশন রীতি :

হালুয়া ঘাটের গাজীর গানে দলপ্রধান বা বয়াতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র থেকে শুরু করে সব চরিত্রই তিনি অভিনয় করেন। ধাপে ধাপে এক চরিত্রের পর যে চরিত্র আসে নারী বা পুরুষ সব চরিত্রে সমান। নারী চরিত্রে আসলে তিনি নারীর মতো অঙ্গ-ভঙ্গিমা, মুখভঙ্গি প্রদর্শন করেন। যেমন, জল তোলার দৃশ্যে কলসি কাঁখে নিয়ে ঠিক নারীর মতোই কোমর হেলিয়ে দুলিয়ে সামনে যাওয়া আসা করতেন এবং এই গান গাইতেন -

"শ্যামের বাঁশি বাজেরে
কমলা আমলা জলে যাই
জলের ঘাটে যাইবরে কমলা
জলের ঘাটে যায়।
কেহ পিনছে সাদারে বালা
কেহ পিনছে লাল
দাসী বান্দি লইয়ারে যাইব
জলেরো লাইগা ॥"[১৮]

আবার পুরুষের চরিত্র আসলে তিনি হয়ে যান সবল পুরুষ। সাধারণত পুরুষ-নারী দুই চরিত্রেই অভিনয় করায় বয়াতির চুল থাকে কিছুটা লম্বা। মূল ভূমিকায় যিনি থাকেন তিনিই সংলাপের পাশাপাশি গান করেন আর সহযোগী যন্ত্রশিল্পীরা পাশাপাশি গানের সুর মেলান বলে তাকে 'বয়াতি' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

পোশাক :

পরনে খাটো পাঞ্জাবি বা ফতুয়া ও লুঙ্গি থাকে। শরীরে চাদরের মতো পেঁচানো থাকে ওড়না ধরনের একটি লাল কাপড়। চরিত্রের প্রয়োজন অনুসারে সে কাপড়টিকে বয়াতি কখনো শাড়ি বা নৌকা , যখন প্রয়োজন সেইরূপে ব্যবহার করেন। কোনো কোনো দৃশ্যে একটি কাপড় যথেষ্ট নয় বলে পাশে অনুরূপ আরেকটি কাপড় রাখা থাকে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে গাজীর গানের আসরে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে হারমোনিয়াম, মন্দিরা, ঢোল, ঝুরি প্রভৃতি। বয়াতি যখন রসালো কথায় কৌতুকের ছলে মজার সংলাপ আওড়ান তখন দর্শক-শ্রোতারা হাসি আর হাততালি দিয়ে তাদের ভালোলাগার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। যেমন, উপস্থিত ছেলে-মেয়েদের কয়েকজনকে বয়াতি জিজ্ঞেস করবে তোমাদের প্রিয় খাবার কী ? উত্তরে স্বাভাবিকভাবে উত্তর আসবে আপেল, বরই, আঙ্গুর, বেদানা ইত্যাদি। এর পরপরই তোমার প্রিয় খাবার কী প্রশ্নের উত্তরে দলের একজন হঠাৎ করে বলে উঠবে আমার প্রিয় খাবার লম্বা কচু, গুঁড়ো শামুক। কেন ? হাঁসে খাইতে পারে আমরা খাইতে পারি না কেন ? গাজী গানের মৌসুম সাধারণত ধান কাটার পর, সবার বাড়িতে যখন ধান চালের পাশাপাশি কারো মনের উদ্দেশ্য পূরণের মানত থাকে।

বাউল গান

ময়মনসিংহের বাউল গানের সাথে দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের বাউল গানের গায়কী ও সুরের পার্থক্য বিদ্যমান। দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের বাউল গান মূলত তত্ত্বমূলক কিন্তু ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউল গানে বিভিন্ন তত্ত্বের পাশাপাশি আছে মানব প্রেম ও প্রকৃতি প্রেমের সমন্বয়ে সৃষ্ট মানবতাবাদী চেতনা। মূলত বাউল গানের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় যে দুটি বিষয় সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে তা হলো গুরুবাদ এবং দেহতত্ত্ব।

গুরুবাদ :

বাউল মতবাদ নিতান্তই গুরুবাদের মতবাদ। শুধু বাউলরাই নয় বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন সাধনমার্গের সাধকগণ গুরুকে সর্বোচ্চ স্থান দেন। এই গুরুভিন্ন সাধনা অন্ধের মতো, অন্ধকারে পথ হাতড়ানো বই আর কিছু নয়। গুরু সিদ্ধকাম পুরুষ। বাউলরা এই গুরুকে দুই রূপে দেখেছেন- মানবগুরু রূপে আর পরমাত্মা বা পরমপ্রিয় হিসেবে। মানবগুরু বিভিন্নভাবে শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন। বিভিন্ন গোপনতত্ত্বের সাথে সাধককে পরিচিত করে তাকে ক্রমে সাধনার বিভিন্ন স্তরে উন্নীত করেন। এই গুরুর মধ্যে আবার শ্রেণি বিভাগ আছে। হিন্দু বাউলরা শ্রীচৈতন্যকে গুরুশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করেন আর সুফী বাউলরা করেন হজরত আলী (রাঃ) কে। সর্বগুরুর গুরু হলেন মাশুক বা মনের মানুষ। এই গুরুকে বাউলরা কখনও সাঁই, কখনও মুরশিদ, কখনও গোঁসাই নামে অভিহিত করেন। বাউল ফকিররা আরো বিশ্বাস করেন যে, মানবরূপে যে গুরু তাঁর সামনে সতত বিরাজমান তার মাধ্যমে পরম পুরুষ সকল প্রকার শিক্ষাদানে রত। তাই এই মুর্শিদের প্রতি বাউল ফকিরদের শ্রদ্ধা অত্যন্ত গভীর।

সকল মানুষের মধ্যে পরম পুরুষের অস্তিত্ব নিহিত থাকলেও যাঁরা ধ্যান-ধারণা ও ঐশ্বরিক প্রেমসাধনায় নিজেদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারেন তারাই প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ মানব। প্রকৃতপক্ষে পরম পুরুষ গুরুরূপে মানুষকে সাধনপথে পরিচালনা করেন। সুফি মতবাদে গুরুর ব্যাখা এই। এই গুরুকে কেন্দ্র করে বাউলের সব সাধনা। সসীম ও অসীমের প্রেম মিলনই গুরুতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন -

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র
তুমি হে তুমি বিচিত্র রূপিনী
অন্তর মাঝে তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।"[১৯]

এই দুই এর মিলনে যে অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি হয় তাই-ই মহাভাব। এই মহাভাবই প্রেমের চরম ও পরম অবস্থা। এই অপূর্ণ আনন্দসত্তাই মানবাত্মা বা প্রকৃতি গুরুস্বরূপ। বাউল সাধনাও এই মানবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনা।

যেমন :

"আমার যায় না দুঃখের দিন হয় না সুদিন
আমি কী রূপে পাব শ্রীগুরুর চরণ
হারায়ে গুরু বস্তু ধন
(আমার) দিনে দিনে দেহ তরী
পাপেতে হয়েছে ভারী
ভবপারে যাইতে নারি
কী করি এখন।"[২০]

এই গুরুই বাউলের আদর্শ, উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। গুরু বা মুর্শিদকে বাউলরা সর্বোচ্চ স্থান দেন। গুরুই তার সকল কর্মের নিত্যসাথী। অর্থাৎ বাউলদের সাধনার সারবস্তু এই গুরুতত্ত্ব। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই গুরুতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণে বলেন -

> "এই স্বরূপের তিনটি অংশ আছে, একটি ভোক্তা, শক্তিমান বা পুরুষ রূপে, আর একটি শক্তি ভোগ্য বা প্রকৃতি রূপে, অপরটি উভয়ের মিলিত একটি মহানন্দ শিহরিত অনির্বচনীয় সম্মিলিত অদ্বয় অবস্থারূপে। দুইটি সত্তার মিলনের দ্বারা এই অনির্বচনীয় তৃতীয় অবস্থা লাভই তাহাদের মূল সাধনা।" [২১]

দেহতত্ত্ব :

বাউল ফকিররা মানবজীবনকে পরম সম্পদ বলে মনে করেন। তাঁদের সব সাধনার মূল এই দেহ। এই দেহকে কেন্দ্র করেই সব প্রেমমূলক উপাসনা। বাউল লালন একটি গানে বলেন, 'দেহের অস্তি-চর্ম সব কিছুই স্বর্ণময়'। এর মধ্য দিয়েই মহারস বা আনন্দধারা প্রবাহিত। আর সেই আনন্দধারার একটি বিন্দুর মধ্যে মহাসিন্ধু লুকায়িত। এই রস সাধনের মাধ্যমে দ্বিদলে 'রূপের ঝলক' দেখা যায়। কিন্তু এই সাধনার আনুষ্ঠানিক আচারের প্রয়োজন নেই, সব কিছু এই 'দেহতেই মেলে'। এই দেহের সাধনাই তাই সর্বসাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা।

"কীবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে
রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে
ফণি মণি সৌদামিনী
জিনি এরূপ উজলে ॥"[২২]

বাউলরা বিশ্বাস করেন এই দেহতত্ত্ব না জানলে তার সাধন সার্থক হতে পারে না। দেহের কোথায় পরম গুরু বিরাজ করেন তা তাকে জানতে হবে এবং এই দেহের তত্ত্ব নিরূপণ করে এই দেহের মধ্যে সাঁইকে পেতে চেষ্টা করলে তার সব সাধনা সার্থক হবে। আত্মচৈতন্যের মূল এই দেহ। এই দেহকে জানার মধ্যে সত্য নিহিত। বাউলরা বিশ্বাস করেন আত্মাকে জানতে হবে। এই আত্মা বাস করে দেহের মধ্যে। সুতরাং তাকে পাওয়ার জন্যই দেহকে অবলম্বন করতে হবে।

এই দেহেই অচিন মানুষ, মনের মানুষ, অধর মানুষের বাস। বাউল তাই তাঁকে খুঁজে পেতে চান আপন দেহের মধ্যে। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন-

> "এই দেহের মধ্যেই যে পরমাত্মা বা মনের মানুষের বাস, বাউলদের এই ধারণার উপর প্রধানভাবে তিনটি প্রভাব পড়িয়াছে। প্রথম, উপনিষদের প্রভাব। দ্বিতীয়, হিন্দুতন্ত্রের ও বিশেষভাবে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব। তৃতীয়, সুফীদর্শনের প্রভাব। উপনিষদে দেহস্থিত এই পরমাত্মা ব্রহ্ম 'পুরুষ' রূপে বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই দেহকে পুর বা নগর বলা হইয়াছে। এই পুরে অর্থাৎ দেহরূপে নগরে বাস করেন বলিয়া আত্মা পুরুষ বলিয়া অভিহিত।"[২৩]

বাউল গান যে সুরে গাওয়া হয় তার নাম বাউল সুর। করুণ ভাব ও কোমল সুরে স্পর্শবহুল এই সুর হাহাকারের মতো বাজাতে থাকে। একতারা, খঞ্জনি, ডুগি, খমক ইত্যাদি যন্ত্র এই গানের সঙ্গে বাজানো হয়। বাউলরা এই গান গেয়ে গেয়ে নাচতে থাকেন। এই নাচ বাউল নাচ নামে অভিহিত।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাউল গানকে বলা হয় 'বাউলা' গান। প্রবাদ আছে-বাউলা গানের আউলা বাও বোঝা বড় কঠিন। 'বাউল'-আধ্যাত্মিক চেতনাপুষ্ট সর্বধর্ম মতবাদে বিশ্বাসী এক সম্প্রদায় বিশেষ লোক। যারা লোকধর্মের অনুসারী তত্ত্বজ্ঞানী ও আত্মসন্ধানী। ময়মনসিংহ জেলার আদি বাউলগণ সংসার-বিবাগী ছিলেন। তাঁরা তাঁদের গানে জীবন ধর্ম ও স্রষ্টার সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক নিয়ে নানা বাউল সংগীত রচনা করেছেন। সুফি সাধকদের গৃহকোণে বসে আধ্যাত্মিকতা চর্চা এবং কবিয়ালদের কবি গান ও বয়াতিদের জারিগানের মাধ্যমে ধর্ম শাস্ত্র চর্চার ডামাডোলের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও লোকতত্ত্ব ভিত্তিক বাউল গানে লোক সংস্কৃতির এক নতুন জগত গড়ে উঠে। আর মৈমনসিংহ গীতিকা অঞ্চলের জন্য এ নতুন বাউল জগতের জনক ছিলেন সাধক রশিদ উদ্দিন। তাঁর বাউল সাধনা ছিল তৎকালীন ধর্ম ও সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। রশিদ উদ্দিনের স্পর্শে গড়ে উঠা মানব প্রেম ও প্রকৃতি প্রেমের সমন্বিত রূপ অত্রাঞ্চলের লোক সংস্কৃতির অঙ্গনকে করে তুলে আরো উজ্জীবিত। বাউল সাধনার ধারা পর্যালোচনা করলে লালন ফকির ও

হাসন রাজার বাউল সাধনার সঙ্গে রশিদ উদ্দিনের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। তাঁর বাউল সাধনা ছিল অন্যান্য বাউল সাধনা থেকে ব্যতিক্রম। যার গভীরে ছিল মানব প্রেম ও প্রকৃতি প্রেমের সমন্বয়ে সৃষ্ট মানবতাবাদী চেতনা। যেমন:

"মানুষ ধর মানুষ ভজ শুন বলিরে পাগল মন
মানুষের ভিতরে মানুষ করিতেছে বিরাজন।"[২৪]

এ গানে মানব প্রেমের এক উদাত্ত আহ্বান ছাড়া কিছুই নয়।

বাউল সাধক বিরহী উকিল মুনশি ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী বাউল চরিত্র। সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও লোকতত্ত্বভিত্তিক বাউল শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য থাকলেও তিনি বিচ্ছেদ গানের জন্য ছিলেন সকলের প্রিয়। শরিয়তপ্রিয় সাধক উকিল মুনশি তাঁর বাউল গানে শুধু একতারা ও চটি ব্যতীত অন্যকোন যন্ত্র ব্যবহার করেননি। তাঁর রচিত রাসুলুল্লাহের গুণকীর্তনে রচিত গানগুলো শরিয়কপন্থী আলেমদেরকেও মুগ্ধ করে। তাছাড়া তাঁর বাউল গানে হাওর অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। যেমন-

"আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানিরে
পূবালী বাতাসে
বাদাম দেইখ্যা চাইয়া থাকি
আমার নি কেউ আসে রে।"[২৫]

এ গানটি হাওর অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতির জীবন্ত রূপ। আধুনিক কালে কোন কবি-সাহিত্যিকের রচনায় হাওর অঞ্চলের এমন জীবন্ত রূপ ফুটে উঠেনি। কারণ উকিল মুনশির রচনায় ছিল হৃদয়ের পরশ।

উকিল মুনশির গানে সমস্ত প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে। উদাস মন ভাবে উকিল মুনশি তাকে লক্ষ্য করে রচনা করেছেন এই বিরহের গান -

"বন্ধু আমার নিঃদুনিয়ার দনরে
তোরে দেখলে জুড়ায় জীবন আমার
না দেখলে মরণ রে।"[২৬]

এ গানে সমস্ত প্রেমিকের আর্তনাদ পুঞ্জিভূত হয়েছে। তাই গান গেয়ে গেয়ে কেঁদেছেন উকিল। উপস্থিত শ্রোতারাও নয়নের জলে ভাসিয়েছেন বুক।

প্রেম পিয়াসী আকাঙ্খা প্রকাশেও উকিল মুনশির রচনা অতুলনীয়। তাঁর কণ্ঠে এসব বাউল গান ছিল অত্রাঞ্চলের প্রাণ। যেমন -

"এমন শুভ দিন আমার কোনদিন হবে
প্রাণ নাথ আসিয়া আমার দুঃখ দেখিয়া
নয়নের জল বন্দে-নি মুছিয়া নিবে।"[২৭]

বাউল উকিল মুনশির কণ্ঠে এ গান আর মৈমনসিংহ গীতিকার তালাকনামা প্রাপ্ত মদিনার আকাঙ্খার মাঝে তফাৎ নেই। মদিনা যেমন তালকনামা পেয়েও স্বামীর আগমন অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুনছে। এ গানে উকিল মদিনার মতো সকলের আকাঙ্খাকে প্রতিধ্বনিত করেছে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে মনে হয় মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, কমলা, সোনাই, মদিনা সহ সমস্ত মানব প্রেমের হৃদয়ের যন্ত্রনা ধ্বনিত হয়েছে উকিল মুনশির মরমী সুরে। তাই উকিল মুনশি ছিলেন মানব প্রেমের চেতনার উত্তরাধিকার। তাঁর কণ্ঠে গীত -

"বন্ধু ফিরে গেল নব যৌবন
আগে দিয়া প্রতিশ্রুতি
হবে চির সাথী
কেড়ে নিলে অবলার মন।"[২৮]

উকিল মুনশির কিছু কিছু গান শুনে মনে হয় যেন সমস্ত মানব প্রেমিককে নিয়ে তিনি নবীজির খাশমহলে যাত্রার আয়োজন করেছেন। উকিল বলেছেন -

"নবীজির খাশ মহলে যাবে যদি আয়রে মন
মাটির মত হইয়া খাঁটী পণ কর জীবন-মরণ।"[২৯]

তাঁর একই ধরণের গান -

"দ্বীন-দুনিয়ার বাদশা তুমি
উম্মতের জামিল, খাতেমুন নবীন।"[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

উকিল মুনশির কণ্ঠের এসব গান সম্ভব করেছিল সাধন। তা না হলে একজন বাউলকে মসজিদ বা ঈদের জামাতে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ সম্ভব ছিলনা।

মানব প্রেমের অমীয় ধরায় সৃষ্ট ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলোর সুর। সে সুরের ধারাবাহিকতাকে বহন করে নিয়েই বাউল জগতে জালাল খাঁর বিচরণ। মহুয়া, মলুয়া, মদিনার অতৃপ্ত বাসনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেই জালাল খাঁ সারা জনম গেয়ে গেলেন 'থাকতে ক্ষুধা প্রেমের সুধা পান করে যা ওরে মন'। এ বিশ্বচরাচরের প্রেমের বন্ধনকে বাউলের সুরে টেনে এনে জানালেন মানবপ্রেমের অপূর্ণ বাসনা পূরণের তাগিদ। তাই জালাল সুদূর অতীত থেকে বেড়ে উঠা বাউল চেতনার মর্মবাণী। এ বিশ্বচরাচরের মায়ার বন্ধন মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ কর্মের ফসল। মানুষ মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন। তবু তার আশা অন্তহীন আশার পিছু পিছু ছুটে বেড়ায় সারা জনম। তবু তাঁর কর্মে সৃষ্ট মায়াজাল তাকে ধরে রাখতে পারে না। এ মানব জীবনের সংকট ফুটে উঠেছে তাঁর গানে। যে সংকট হলো মানব প্রেমের চেতনার উৎস।

যেমন:

"চিনগে মানুষ ধরে
মানুষ দিয়া মানুষ বানাইয়া
সেই মানুষে খেলা করে ॥"[৩১]

মানব সৃষ্টির রহস্য কথা তুলে ধরছেন এই গানে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিতে বিরাজমান। স্রষ্টাকে পুরুষ এবং সমস্ত সৃষ্টিকে রমণী ভেবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেমের বন্ধন নিরূপন করেছেন। এখানে সৃষ্টিকে স্রষ্টার আধার রূপে চিত্রায়ন অপূর্ব।

বাউল সাধক রশিদ উদ্দিন ময়মনসিংহ অঞ্চলে ব্যতিক্রমধর্মী বাউল ধারার জনক। মালজোড়া বাউল চর্চা রশিদ উদ্দিনের অমর কীর্তি। পরবর্তীতে মালজোড়া বাউল গানের ধারাকে গোটা মৈমনসিংহ অঞ্চলে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য জালাল খাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। বাংলার লোকসাহিত্যে ভান্ডারের বিভিন্নমুখি লোক সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের নির্যাস হলো মালজোড়া বাউল জগৎ। ত্রিশের দশকের গোঁড়া থেকেই ময়মনসিংহ অঞ্চলে মোলজোড়া বাউল গানের প্রচলন। এর পূর্বে বাউল গান হলেও তা ছিল

বৈঠকী বাউল। হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে সপ্তাহব্যাপী বা পক্ষকালব্যাপী বাউলের মালজোড়া গান পরিবেশিত হতো।

তৎকালীন সময়ে বাউলদেরকে শুধু আমন্ত্রণ জানানো হতো গানের জন্য। আর এই আমন্ত্রণের সঙ্গে ঘোষণা থাকতো কার সংগে কার গানে প্রতিদ্বন্দিতা হবে। এই প্রতিদ্বন্দিতার আমন্ত্রণ পেয়েই বাউলগণ আসরে বা মঞ্চে গান করার জন্য উপস্থিত হতেন। বাউলের সংগে আমন্ত্রণ জানাতেন মালজোড়া গানের ধরাট বিচারের বিচারকদের। কোন তত্ত্বের উপর প্রতিদ্বন্দিতা হবে তা উপস্থিত দর্শক শ্রোতা কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার রেওয়াজ চালু ছিল। মঞ্চ তৈরি করা হতো, যাত্রামঞ্চের অনুরূপ সকল দিক খোলা। মঞ্চের উপর থেকে শুরু করে চারিদিকে দর্শক শ্রোতাদের বসার স্থানের উপর পর্যন্ত চাঁদোয়া ঝুলিয়ে দেয়া থাকে। অংশগ্রহণকারী সমস্ত বাউলগণ মঞ্চে বসে থাকতেন এবং সঙ্গে থাকতো বাদকগণ। মঞ্চের এক পার্শ্বে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে বসতেন বিচারকবৃন্দ। বাউলগান চলতো সাধারণত বিরামহীনভাবে। প্রত্যেকে বাউল মঞ্চে উঠে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গান করতেন। গানের তালে তালে বাউলের লম্বাচুল ও অঙ্গভঙ্গি সত্যি মন ভুলানো। ক্ষেত্র বিশেষে গানের কোনো কোনো পর্যায়ে হাঁটু গেড়েও গান করে থাকে বাউলগণ। মালজোড়া গানে বাউল প্রথমে উঠে তত্ত্ব ভিত্তিক একটি গান পরিবেশন করেন। শেষ গানের শেষে গানের সুরেই শ্রোতাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে প্রতিদ্বন্দ্বী বাউলের প্রতি ধরাট (প্রশ্ন) উত্থাপন করেন।

ধরাট শব্দটি ধরা শব্দ থেকে সৃষ্ট। এ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী এক বাউল অপর বাউলকে প্রশ্নবানে ধরে আটকিয়ে পরাস্ত করার প্রয়াস থেকেই ধরাট শব্দের নামকরণ। তবে মালজোড়া বাউল গানের ক্ষেত্রে সুর, তাল ও স্বরচিত গানের শব্দ চয়ন এবং মর্মার্থের গভীরতা সবকিছু মিলিয়ে একজন বাউলকে দর্শক শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করতে হয়। ধরাটে জয় পরাজয় সচরাচর নির্ধারিত হয় না। কেননা ধরাটে পারদর্শী না হয়ে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মালজোড়া গানে অংশ নেয় না। তাই দর্শক শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জনের জন্য একজন বাউলকে ধরাট বিদ্যার পাশাপাশি সুন্দর করে গভীর মর্মার্থক গান রচনা সহ সুর ও তাল সংযোজন করতে হয়। আর ধরাটে হেরে যাওয়া মানে মালজোড়া বাউলগানে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার সামিল।

মালজোড়া বাউলগানের উদাহরণ -

"প্রভু এই বিশ্ব ভূমন্ডল সৃজিয়াছ সকল

তবু কেন ধরাতলে থাকো লুকি দিয়া ॥"[৩২]

এই বাউল গান পরিবেশনের পর প্রতিদ্বন্দ্বী বাউল সাধকের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের উপর দুটি প্রশ্ন বা ধরাট প্রদান করেন। এ ধরাটগুলো ছিল কথিত গানের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ -

"ওরে গুনধন ----

এই সমস্ত ছেড়ে দিয়া ত্রিপদীতে দাও বাজাইয়া

করি একটু রসের আলাপন

প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে আমি করি জিজ্ঞাসন।

সুন্দর করে দাও বুঝাইয়া সৃষ্টির বিবরণ ॥"[৩৩]

আমি প্রথম জানিতে চাই মাটি, হাওয়া এবং আগুন কিভাবে সৃষ্টি হলো। পানি সহ গোটা দুনিয়া কয়দিনে সৃষ্টি হলো।

"এই আমার জিজ্ঞাসা করে দাও খোলাসা

আনন্দিত কর সবার মন

ওরে গুণ ধন ॥

বাজাও বাজাও যন্ত্রীওয়ালা পূর্বেরই মতন

পূর্বেরও রাগিনী দিয়া দেই গানটি নামাইয়া

ভুলত্রুটি হইলে সভায়, করিবেন মার্জন ॥"[৩৪]

আপর বাউল মঞ্চে উঠে দাঁড়ান এবং দর্শক শ্রোতাদের গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি দেহতত্ত্বমূলক গান পরিবেশন করেন-

"অন্তরে অন্তরে দেখ সবে চিন্তা করে

প্রভু সাঁই পরোয়ারে কি খেলা খেলায় ॥"[৩৫]

এই গানটি শেষ করত প্রথম বাউল ধরাটের উত্তর প্রদান শুরু করেন-

"পাঠান সাহেবের কথা শুনে ভয় হইল আমার মনে

কেমন ভাবে করে জিজ্ঞাসন

ওরে গুণধন ॥"[৩৬]

এই ভাবে ধরাট পাল্টাধরাটে মালজোড়া গানে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি হতো।

ভাটিয়ালি

লোকসংগীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখাটি হলো ভাটিয়ালি গান। ভরা বর্ষা মৌসুমে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার হাওর-বিলে পালতোলা নৌকার পাছা গলুইয়ের হাল ধরে বসে থাকা মাঝির উদাস কণ্ঠের ভাটিয়ালি গান যারা শুনে তারাও কয়েক মুহূর্তের জন্য উদাসীন হয়ে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাটিয়ালি গান পরিবেশন কালে একক লোকবাদ্যযন্ত্র হিসেবে সারিন্দা বা বেহালার প্রয়োগ করা হয়। প্রেমই মুখ্য বিষয় হলেও সাধারণ কৃষক, মাঝি-মাল্লার নান কথা তথা সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনা, ভক্তি, ভালোবাসা একান্তভাবে সরল সুরে ব্যক্ত হয় ময়মনসিংহের ভটিয়ালি গানে।

বিষয় এবং সুরবৈচিত্র্যঃ

ভাটিয়ালি ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক কণ্ঠের সুর-প্রধান গান। এ গানে তাল ও বাদ্যযন্ত্রের প্রাধান্য কম। গায়ক কতক শব্দ পরপর উচ্চারণ করে স্বরটি ধরে দীর্ঘ টান দেন। সুরের এই লহর বা টান উচ্চগ্রাম থেকে শুরু হয়, শেষে খাদে নেমে আসে। প্রলম্বিত এই টানের স্থিতি গায়কের দম ও মর্জির উপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন -

> "ভাটিয়ালি গীত-রীতির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহার প্রথম কয়েকটি শব্দ একসঙ্গে গীত হইবার পর ইহার সর্বশেষ স্বরটি দীর্ঘায়িত হইয়া উচ্চারিত হইতে থাকে; এই দৈর্ঘ্যের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিমাপ নাই, গায়নের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী ইহা যে কোনো সীমায় গিয়া পৌঁছতে পারে। প্রারম্ভ পদটিই সর্বাপেক্ষা চড়া সুরে উচ্চারিত হইবার পর পরবর্তী পদগুলির ভিতর দিয়া তাহা তখনও ক্রমে কখনও বা আকস্মিকভাবে খাদে নামিয়া আসে। ভাটিয়ালির সমস্ত জোর গিয়া প্রথম পদটির উপরই পড়ে এবং প্রথম পদটির ভাবই ক্রমে অন্যান্য পদগুলির মধ্য দিয়া নিম্নতর সুরে প্রকাশ পায়।"[৩৭]

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাটিয়ালি গানের সুর প্রধানত করুণ। এ ঞ্চলের প্রেমের গানে বিরহ-বিচ্ছেদ এবং অধ্যাত্মিক গানে অনিত্য সংসারের হতাশা-নৈরাশ্য এবং ঈশ্বরকে না পাওয়ার শূন্যতা-বেদনা প্রকাশ পায়। ভাটিয়ালি গানে গায়কের আবেগ মথিত চিত্তদীর্ণ এই কান্না দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এজন্য ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাটিয়ালি গানের অবয়ব ক্ষুদ্রাকার হয়। অনেক গান স্থায়ী ও অন্তরা দ্বারাই সম্পন্ন হয়; তবে স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারীযুক্ত গানের দৃষ্টান্ত আছে। ভাটিয়ালি গানের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন-

> "রচনার দিক দিয়া ভাটিয়ালি নিতান্তই সরল এবং সংক্ষিপ্ত। বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে ইহার রচনাই সংক্ষিপ্ততম; ইহার কারণ কথার পরিবর্তে স্বরই এখানে প্রাধান্য লাভ করে। সেইজন্য ইহাতে কথার প্রয়োজনীয়তা বেশি নাই।"[৩৮]

বিষয়ের দিক থেকে ভাটিয়ালির যে তিনটি প্রধান ভাগ আছে তার মধ্যে লৌকিক প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ভাটিয়ালি গান ময়মনসিংহ অঞ্চলে অধিক প্রচলিত এবং চর্চিত। উদাহরণ হিসেবে লৌকিক প্রেম-বিরহের ভাটিয়ালি গানের অংশবিশেষ ও স্বরলিপি নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

এই কংশ নদীর বাঁকে
কে যে আমায় ডাকে
অষ্টপ্রহর এ মন আমার তারি ছবি আঁকে ॥
ও তার কাঙ্খে বুঝি কলস
(আমার) মন যে হলো অলস
উদাস নয়নে সে যে চেয়ে থাকে ॥

(কথাঃ রইস মনরম, সুর ঃ দুলাল চৌহান)

স্বরলিপি :

(০)					(+)				
৫	৬	৭	৮	।	১	২	৩	৪	
		সা	সা	।	া	া	সা	রা	**I**
		এ	ই		০	০	ক	ং	
রা	মা	া	া	।	ধা	পা	মা	ধা	**I**
শ	ন	দী	র		বাঁ	০	০	০	
ধা	ধা	ণা	ধা	।	পা	া	া	ণা	**I**
কে	০	০	০		০	০	কে	০	
ধপা	মা	া	া	।	মা	া	া	পা	**I**
যে	আ	মা	য়		ডা	০	০	০	

মা গা রা সা । া া সা সা I
কে ০ ০ ০ ০ ০ অ ষ

রা সা ণা্ ণা্ । সা া া সা I
ট প্র ০ হর এ ০ ম ন

রা মা মা গা । রা রা মজ্ঞা জ্ঞা I
আ ০ মা ০ রা ০ তা ০

জ্ঞা রা রা সা । সা া া সা I
রি চ ০ বি আঁ ০ ০ ০

৷৷

সা া II
কে ০

পা পা । পা পা মা মা I
ও তা ০ র কা ০

পা ণা পা পা । র্সা া া র্সা I
জ্ঞে বু ০ ঝি ক ০ ০ ০

র্সা র্সা র্সর্রা র্সা । ণা া া ণা I
ল স আ মা র ০ ম ন

র্সা র্সর্রা সা সা । ণা ণা ণা ণা I
যে হ লো ০ অ ০ ০ ০

ণা	ধা	পা	মা	।	া	া	মা	মা	I
ল	০	০	স		০	০	উ	দা	
পা	া	া	া	।	ধা	া	া	ধা	I
০	স	ন	০	।	য়	০	০	০	
আ	ণা	ণর্রা	সা	।	ণা	া	া	ণা	I
নে	০	০	০		০	০	সে	০	
আ	পা	ধা	পমা	।	পা	া	া	পা	I
যে	চে	য়ে	০		থা	০	০	০	
						॥			
পা	া	া	া	।	া	পা	I I		
কে	০	০	০		০	০			

ময়মনসিংহ অঞ্চলের আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ভাটিয়ালি গানের উদাহরণ -

"আরে ও ভাটির গাঙ্গের নাইয়া
নদীর মোহনা কত দূর আমারে যাও কইয়া ॥
আমি জনম ভরা তরী বাইলাম
ভাইটালি সুর গাইয়া ॥
কোন গিরি চূড়া ভাঙ্গিয়া, কুল কুল সুরে চলছে নদী
দুকূল ডিঙ্গাইয়া।
মাসে মাসে জোয়ার আসে রক্ত-গঙ্গা লইয়া ॥
কয়বার আইলাম কয়বার গেলাম,
না পাইলাম কিনারা।
এ গাঙ্গের তরঙ্গে কত

ডুবল রঙ্গের ভরা।
তাপস নাইয়া সাহস ভরে
পাল তুলে হাল দিচ্ছে ধরে।
তারা ধারা চিনে তরী ছাড়ে,
(কৃষ্ণ) নামের সারি গাইয়া ॥
দীন উপেন্দ্রের এই জীর্ণ তরণী
নব ছিদ্রে উঠে পানি কি হয়না জানি
এখন গুন টেনে যাও গুনগুন করে
আর গুরু দয়ালের নাম গাইয়া ॥"[৩৯]

মাজারের গান

দেশের অন্যান্য জেলার মতো ময়মনসিংহ জেলার প্রতিটি উপজেলাতেই রয়েছে অনেক মাজার। মাজারসমূহে ভক্ত আশেকানরা আরাধনা করে পরকালে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া মাজারগুলোতে প্রতি বছর বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হয়। ওরস তাছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভক্তবৃন্দের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। নানা নিয়ম-কানুন পালনসহ এসব অনুষ্ঠানে, গাওয়া হয় এক ধরনের বিশেষ গান। মাজারে পরিবেশিত হওয়া এই গানগুলো মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হয়। গানের সুরে করুণ রস এবং লম্বা টানের প্রাধান্য থাকে। মূলত প্রার্থনার জন্যই এই করুণ রস। গানের তালে ভক্তবৃন্দ মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে নেচে নেচে জিকির করেন। দয়ালের প্রেমে হন অশ্রুসিক্ত। এটাই মাজারের গানের বিশেষ সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য।

উড়ি গান

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এলাকায় প্রতিবছর হোলি খেলায় আসর বসে উড়ি গানের। এ গানের সাথে গ্রামের সাধারণ ও সহজ নৃত্য প্রচলিত। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় ঢোল ও করতাল জাতীয় লোকবাদ্য। গানের বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ। সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই গানগুলো গাওয়া হয়। খুব সহজ সুর ও আনন্দ রসের উপস্থিতিই উড়ি গানের মূল বৈশিষ্ট্য। ময়মনসিংহ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে এখনও উড়ি গানের প্রচলন আছে।

যেমনঃ

(০১)

"কমলকে পাইয়া তুমি
কমল তুমি হারাইলে
আশা কমল পাশে কমল
ঝুলে রইলে কমলে।
পাইয়া কমলে সঙ্গী
কমলে হইলে বন্দি
পাইয়া ননদি কমল।"[৪০]

(০২)

"বাড়ি ভিটার দফাসাফা
সব হইল আমার ॥
নিষ্করে বসতি করি
এখন দয়াল মালিক আমার ॥
এই সুন্দর বাড়ি যেদিন বান্ধিলাম
চার কিস্তিতে খাজনা দিব
পাট্টা করিলাম।
আমি পাট্টা করে মত্ত হইলাম
ভুলে গেলাম কিস্তি দিবার ॥"[৪১]

কর্মসংগীত

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলা শ্রমিক শ্রেণির লোকেরা বিভন্ন কর্মসংগীত পরিবেশন করেন তাদের কাজের সময়। যেমন, কোনো নির্মাণ শ্রমিক ইট টানার সময় কিংবা ছাদ তৈরির সময় কিছু উদ্দীপনামূলক কথা উচ্চারণ করেন। এসব কথা ও সুরের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। তাৎক্ষণিকভাবে যা মনে আসে তাই সুর করে বলেন। একজন সুর তুললে অন্যরাও তাতে দোহার দেন। এতে কাজের মধ্যে উৎসাহ জাগে।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কোনো গাছ কাটার শ্রমিক বা করাতি গাছ কাটা ও সরানোর সময় বিভিন্ন কথা উচ্চারণ করেন তার সঙ্গে অন্যরাও দোহার দেন।

যেমন-

"দলনেতা	:	মারো ঠেলা
দোহার	:	হেইও।
দলনেতা	:	জোরে মারো
দোহার	:	হেইও।
দলনেতা	:	আরে সামনে মারো
দোহার	:	হেইও।
দলনেতা	:	পিছন থেইক্কা
দোহার	:	হেইও।
দলনেতা	:	কেউ বুড়া না
দোহার	:	হেইও।"[৪২]

এভাবে শ্রমিকরা বিভিন্ন কথা উচ্চারণ করে তাদের কাজের শক্তি জোগানোর প্রয়োজনে। আর সেই কথাগুলো কর্মসংগীতে রূপান্তরিত হয়।

গাইনের গীত

কিসসা পালার মতো গাইনেরগীতও বৃহত্তর ময়মনসিংহের গ্রাম-গঞ্জে গীত হয়ে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। পালা কীর্তন পরিবেশনের যেমন নিজস্ব দল থাকে, গাইনেরও তেমনি দল থাকে। গাইনের গীতের মূল উদ্দেশ্য হলো আনুষ্ঠানিকভাবে আনন্দ ফূর্তিকরা। এ গানে পাইলের ভূমিকা খুবই আনন্দদায়ক; সেজন্য পাইলকে বড় বেশী রসিক ব্যক্তি হতে হয়। মাঝে মাঝে মজার কৌতুকময় কথা গানের মাধ্যমে বলে সে সকল শ্রোতার মন আকর্ষল করে এবং প্রচুর হাস্যরস সৃষ্টি করে থাকে। 'গাইন' প্রায়ই 'গাজীর গাইন' নামে পরিচিত হয়ে থাকে। এর কারণ 'সুন্দর বন মোকামে গাজী-জিন্দাপীরের' আচানক কেরামতি কিস্‌সাই এসব গাইন বিশেষভাবে বয়ান করে, তবে অন্যান্য কিস্‌সা-কাহিনীও তাদের গানের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে।

গাইনের গীতের শিল্পীদের মেকাপ বা পোশাক থাকে হাস্যকর এবং লোকজ। যেমন-চাড়াল চরিত্রের ইয়াবড় গোঁফ। যুবক চরিত্র টাইট-ফিট জামা, কালো মাফলার, পায়ে লাল মোজা। নমশূদ্র চরিত্রে টিকিতে

Dhaka University Institutional Repository

জবাফুল, পরনে ধূতি, হলুদ পাঞ্জাবি, হাতে চুড়ি, গলায় মেডেলের বহর, কাঁধে ঝুলানো দোতারা। ময়মনসিংহ অঞ্চলের গাইনের গীতে অধিকাংশ গাইনই গান গাইবার সময় লাল রঙ্গের 'ঘাগরি' (ছায়া) এবং ব্লাউজ পরিধান করে। প্রত্যেক গাইনের সঙ্গে একখানি 'আশা' (একটি লৌহদন্ডের উপরে অর্ধচন্দ্র স্থাপিত) ও আধা হাত পরিমিত কাষ্ঠদন্ডের মাথায় একগুচ্ছ চুলযুক্ত জিনিস থাকে। মাটিতে আশা পুঁতে তাকে ভক্তি করে পানিতে চুলগুচ্ছ ভিজিয়ে সে শ্রোতাদের এবং নিজের গায়ে পানি ছিটা দিয়ে সেটি 'আশার' উপর স্থাপন করে গান শুরু করে। গাইনের গীতে একতারা, দোতারা, খমক, মৃদঙ্গ বা ঢোলক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। সহশিল্পীগণ প্রথমে একবার বাদ্য বাজায়, তার পর বন্দনা গাওয়া হয়। পালা গানের মতো গাইনের গীতেও গায়েন বন্দনা দিয়ে গীত শুরু করেন। যেমন-

"আল্লা আল্লা বল ভাইগো নবী কর সার
নবীর কালেমা পড় হৈয়া যাবে পার ॥
আল্লা আল্লা বল ভাইগো যত মমিনগণ
গাজী জিন্দাপীরের কথা শোন দিয়া মন।
সোয়া লক্ষ নবী বন্দি আশি হাজার পীর
সুন্দরবন মোকামে বন্দি গাজী জিন্দাপীর
সভা কইরা বইছুইন যত হিন্দু মুসলমান
সবারই চরণে জানাই অধমের সালাম ॥
আমি অতি মূর্খমতি বিদ্যা-বুদ্ধি নাই
গীত গাইয়া শান্তি দেওয়ার আমার সাধ্য নাই ॥
বাড়ি আমার বকশীমূলে নাম আরজ আলী
আপনাদের ঠাই আইসা আইজ বিরক্ত করবাম খালি।

গাইনের গীতে শ্রোতাদের আনন্দ দিতে গাইন নানান মসকরার আশ্রয় নেন। যেমন :

গাজী বলে কালু ভাই গো আমার শল্যা লও
আলের দুইডা বলদ বেইচ্যা মুরগী কিন্যা লও
মুরগা নাচে মুরগী নাচে চালা দুই ঠ্যাং থুইয়া
হউরি বউয়ে কাইজ্যা কওে চ্যাপা ভত্তা লইয়া ॥"[৪৩]

মেয়েলি গীত

মেয়েলী-গীত বা মেয়েলী গানই ময়মনসিংহের লোক-সংগীতের বিশিষ্ট স্থানের দাবীদার। বিশেষতঃ পল্লীবাসীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্তটা জীবনের রূপরেখাই অঙ্কিত রয়েছে মেয়েলী গীতে। এক সময় গ্রামে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কুলীন-অকুলীন প্রায় সমস্ত গৃহস্থ ঘরেই এর বহু মাত্রিক প্রচলন ছিল। কিন্তু বিশ শতকের শুরু থেকে এর বিস্তৃতি কমতে কমতে বর্তমানে কেবল নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ ঘরে এসে ঠেকেছে। গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা দরিদ্র ঘরেও ইদানিং এর প্রচলন দারুনভাবে কমে আসছে। বাংলাদেশের অনেক স্থানে এই গীতের প্রচলন থাকলেও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলেই এটি ব্যবপক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। মেয়েলি গীত পরিবেশনের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। বাদ্যযন্ত্রেরও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হয় না কোনো মঞ্চেরও। বিশেষ কোনো পোশাকেরও প্রয়োজন নেই। গীত পরিবেশনকালে দর্শকরা ভিতর থেকে নানা ধরনের আনন্দ ও দুঃখসূচক শব্দ ব্যবহার করেন। গীত শুনে দুঃখে কাতর হন, কখনও সুখের হাসি হাসেন। কখনওবা দর্শকদের ঠাট্টা মশকরা করতে দেখা যয়।

ময়মনসিংহের পল্লী অঞ্চলে প্রধানত পাঁচ ধরনের মেয়েলী গীত পাওয়া যায়। এগুলো হলো -

১) নতুন দামান্দের গীত।

২) কইন্যা সাজানো গীত।

৩) কইন্যা বাখানীর গীত।

৪) কইন্যা বিদায়ের গীত ও

৫) আউজ ঘরের গীত।

যেমন, গ্রামে কারও ঘরে সন্তান হলে নবজাতকের ৬ষ্ঠ দিবস গত রাত্রে এই গীতের অনুষ্ঠান হয়। দাওয়াত করে আনা হয় গীত পটিয়সী রমনীদের তাদের সাথে তো নবজাতকের মায়ের আত্মীয়ারা রয়েছেই। নবজাতকের কোন আত্মীয়দের মধ্যে কেউ বাজার থেকে বিভিন্ন ব্যঞ্জন এনে এদের সমাদর করেন। আনা হয় প্রসূতির জন্য নতুন শাড়ি, ধাত্রীর জন্য শাড়ি, শাশুড়ি ও মায়ের নতুন কাপড়-চোপড় ও নবজাতকের পোশাক-আশাক। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক হিসাবে আনা হয় আতপ চাল, কলা, গুড়, দুধ ও পান সুপারি। সন্ধ্যে হওয়ার আগেই গীতওয়ালীরা আঁতুর ঘরে চলে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হয় গীত। নবজাতক কাঁদলে কিংবা ঘুমুতে দেরি করলে -

"অলী ললীগো কাল বাদুরের ছাও

বাদুর গেছে মধু আনতো, শুইয়া নিদ্রা যাও

অথবা

বিন্দা ওয়ালী মাইয়াগো কালাবাদুরের ছাও
পাইল্যা লাইল্যা ডাঙ্গর করলাম
ফড়িং ধইরা খাও ॥"[৪৪]

বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়লে শুরু হয় সেই রাত্রির আসল পালা -

"চিকন বিবি ছিনান করে
শানে বান্দাইল ঘাটেগো, শানে বান্দাইল ঘাটে
দীঘির পাড়ে বাইন্যা পুলা
চতুর্দিকে দেয় দোলা
শানে বান্দাইল ঘাটে ॥
আগে দুগুন কইছলারে বাইন্যা
আমারে করবা বিয়া
অহন কেনে কান্দরে বাইন্যা দীঘির পাড় বইয়া ॥"[৪৫]

ময়মনসিংহ অঞ্চলের মেয়েলি গানের অংশবিশেষ ও স্বরলিপি ঃ

"ও নানী আইল পানি
খাল বিল নদী ভইরা
নাইয়র যাইতে ইচ্ছা করে
বন্ধুর নায়ে চইড়া"

(কথাঃ রইস মনরম, সুর ঃ দুলাল চৌহান)

<u>তালঃ কাহারবা</u>

মাত্রা সংখ্যা ৮। বিভাগ ২টি । যথাক্রমে ৪/৪ ছন্দে বিভক্ত। একটি সমপদী তাল। একটি তালি ও একটি খালি আছে। বাংলা লোকসংগীতে এই তাল বহুল প্রচলিত।

Dhaka University Institutional Repository

তবলার বোল :

+					০				+
ধা	গে	তে	টে	।	না	কে	তু	না।	ধা
১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮।	১

স্বরলিপি :

	(+)					(০)			
	১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮
	সা	সঋা	সা	ণ্	।	সা	সঋা	সা	ণ্ **I**
	ও	০	না	নী		আই	ল	পা	নি
	সা	সদা	পা	মা	।	গা	মা	া	া **I**
	খাল	বিল	ন	দী		ভই	রা	০	০
	পা	পদা	ণ	দপা	।	মা	পা	দাপ	দা **I**
	নাই	য়র	যাই	তে		ই	চ্ছা	ক	রে
	সা	ঋা	মা	গা	।	ণ্	সা	া	া **I I**
	ব	ন্ধুর	না	য়ে		চই	ড়া	০	০

কবিগান

বৃহত্তর ময়মনসিংহে কবিগানের প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছে তা নির্ণয় করা সত্যিকার অর্থেই দুরূহ। বিষয়টি নিশ্চিত করে বলার মতো কোন প্রমাণ-পঞ্জিও নেই। ময়মনসিংহের কবিগানের শুরু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিজয় নারায়ণ আচার্য ১৩২৩ সনের আষাঢ় 'সৌরভ' পত্রিকায় বলেন -

> "অনেকে অনুমান করেন যে ময়মনসিংহের বোরগ্রাম নিবাসী প্রখ্যাত কবি নারায়ন দেবের 'পদ্মপুরান' বা 'মনষার ভাসান' রচনার কিছুকাল পূর্ব হইতে এ স্থানে কবি গানের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। দুই

> চারটি প্রাচীন কবি গানের ভাষা ও পদ্মপুরাণের ভাষার সাদৃশ্য দর্শনে কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, ময়মনসিংহের কবিগান পদ্মপুরানের সমবয়স্ক, সে যাহা হউক, কবি গান যে বহু পূর্বকাল হইতেই ময়মনসিংহে প্রচলিত হইয়াছে এ কথায় আর সন্দেহ নাই।"[৪৬]

বিজয় নারায়ন সরকার বলেন-

> "উদ্ভব কালে বর্তমান সময়ের মত ঢোল-কাশী সংযোগে কবি গান করা হইত না। তখন খোল, করতাল আর বেহালার প্রচলন ছিল। এখনকার মত তখন কবিগানে ছড়া-পাঁচালি এত অধিক মাত্রায় হইত না। কেবল দলের বিশ্রামের জন্য দু'চার কথা বলা হইত মাত্র।এখন যেমন কথার কাটাকাটি হয়, চালাকি চাতুরি প্রদর্শন করা হয় কৌশলপূর্ণ উত্তর করিয়া 'বাহবা' লওয়া হয় তখন তা না হইয়া কেবল গান, গানের জওয়াব, টপ্পা, টপ্পার জওয়াব হইত। ইহাতেই কবিগানের কৃতিত্ব প্রকাশের স্থল বহু-বিস্তৃত ছিল।"[৪৭]

ময়মনসিংহের কবি গান ছিল বিশুদ্ধ কবি গান। এ গানের বিশেষত্ব হল দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। একদল যে বিষয়ে গান গাইবে সে গান শেষ হলে অপর দল কোন বিপরীত বিষয়ে তার গান গাইবে। শেষ পর্যন্ত গানের বাঁধুনিতে এবং গায়কীতে যে দল উৎকৃষ্টতর প্রতিপন্ন হবে তারা বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করবে। সিরাজউদ্দীন কাশিমপুরী ময়মনসিংহের কবি গানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন-

> "বিশুদ্ধ কবিগান পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক কিংবা সাময়িক কোন ঘটনা বা বিষয় (রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, কৃষি, ব্যক্তি বিশেষের জীবনকথা) লইয়া সভাতেই বিরচিত ও গীত হইয়া থাকে।"[৪৮]

কবিগানের কবিয়ালকে 'সরকার' বলা হয়। তাদের সাথে থাকেন সহকারী, স্মারক, গায়ক, ঢোলী, করতাল বাদক, বেহালা বাদকসহ আরো অনেকে। কবিগানের জন্যে খোলা মঞ্চ করা হয়। মঞ্চের চারপাশেই দর্শক বসে কবিগান উপভোগ করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষই কবিগানের সরকার বা কবিয়াল। কবিয়ালরা সাধারণত পাজামা ও পাঞ্জাবি পরেই কবিগান গেয়ে থাকেন। তাঁদের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কিছু অঙ্গভঙ্গি করতে হয়। তবে শরীরের তালটা রাখতে হয় সারাক্ষণ। কারণ কবিগান নির্দিষ্ট তাল, মান, তান ও লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী সেগুলো নির্দেশ করেছেন এইভাবে-

> "কবিগানের নির্দিষ্ট তাল, মান, লয় ও ছন্দ আছে। ইহার পদ বিন্যাসের মাত্রা নির্দিষ্ট। প্রায় প্রত্যেক আসরেই দেখা যায় চারটি কলিতে প্রত্যেক গান রচিত হয়। কলি চারটি এই: ধুয়া, অন্তরা, চিতান ও পরচিতান। বিশুদ্ধ কবি গান 'কেঁকী' তালে গাওয়া হয়। সখী-সংবাদের প্রথম কিতান মাত্রই 'কেঁকী'। ইহার পরবর্তী সুর সরল ও সহজ।"[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি, উপস্থাপন, সুর, রাগিনী ও কলাবিধি সকল দিক দিয়েই ময়মনসিংহের কবিগান বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। যাদের অসাধারণ সৃষ্টিকর্মে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগান আজ সমাদৃত তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিয়াল হলো- লোচন কর্মকার, হারাইল বিশ্বাস, চন্ডী প্রসাদ ঘোষ, কানাইনাথ ও বলাইনাথ, লোকনাথ চক্রবর্তী ও শক্তিরাম কাপালী প্রমুখ। ময়মনসিংহ অঞ্চলে বর্তমানে হালুয়াঘাটে কবিগানের প্রচলন রয়েছে। এ অঞ্চলের কবিগানের পরিবেশন রিতি নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণিত হলো -

হালুয়াঘাটের কবিগান :

হালুয়া ঘাটের কবিগানের আসরে প্রথম একজন কবিয়াল বা সরকার মঞ্চে উঠে বন্দনা পরিবেশন করে। বন্দনা মূলত ছড়ার ছন্দে সামান্য সুরে গাওয়া হয়। বন্দনা শেষ করে দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রেখে যে বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কবির লড়াই হবে, সেই বিষয়ের পক্ষে নিজেকে দাঁড় করাতে হয়। অর্থাৎ প্রথম যে সরকার মঞ্চে উঠবে সেই সরকারই বিষয়ের পক্ষে অবস্থান নিবে। আর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় হবে দ্বিতীয় সরকার। তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন করবে সরকার এবং সঠিক উত্তর দেওয়ার আহবান জানিয়ে যে বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হবে সেই বিষয়কেন্দ্রিক একটি গান গাইবে। চতুর্থ পর্যায়ে দিশা দিবে সরকার। দোহাররাও তার সংগে দিশায় অংশ নিবে। পঞ্চম পর্যায়ে পাঁচালি গাওয়া হবে। পাঁচালি তাৎক্ষণিকভাবেই গাওয়া হয় না। উপস্থিত দর্শকদের মন কী চাইছে তা আসরে পরিবেশ, যেই অঞ্চলে আসর গাওয়া হয় সেই অঞ্চলের পর্যায়ে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য।

প্রথমপক্ষ আসর গেয়ে বসে যাবার পর দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সরকার মঞ্চে উঠে এবং একই পর্যায়ে আসরে গান গেয়ে থাকেন। প্রতিপক্ষের সরকারের কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করে বসে যান। অবার মঞ্চে উঠেন প্রথম পক্ষের সরকার।

একপর্যায়ে দুজনে মিলনগান বা মালজোড়া গেয়ে কবিগান শেষ করেন। মিলনগান গাওয়ার সময় দুই সরকারের কোলাকুলি হয় এবং হাতে হাত মিলায়। দর্শকরাও এইসময় খুব মজা পায়। তারা খুব জোরে হাত তালি দেয়। নিম্নে কবি গানের বন্দনার অংশ বিশেষ তুলে দরা হলো -

বন্দনা :

"নমস্ত বর্সাণী ঈশান ইন্দ্রানী
তুমি মা ভবতারা আমি অতি অভাজন
না জানি সাধন ভজন, পেতে তোমার শ্রীচরণ
ভাবি সারাৎ সারা
আমি এসেই ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে
পড়েছি ভীষণ সংকটে, কীসে বা তরোই
ভার দিলাম তোর শ্রীচরণে
যা করিস মা নিজগুণে ॥"[৫০]

বাইদ্যার গান

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাইদ্যার গান দুই রীতিতে গাওয়া হয়। কিসসার রীতিতে এবং নাট্যপালা হিসেবে। বয়াতি বা গায়ক কিসসা পরিবেশনায় বর্ণনার, সুরের, নৃত্যের ও অভিনয়ের সাহায্য নেন। গানে, সংলাপে, অভিনয়ে বাইদ্যার গান বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

পরিবেশনরীতি :

গীত, নৃত্য ও সংলাপের মধ্যদিয়ে পরিবেশিত হয় ময়মনসিংহের বাইদ্যার গান। এ গানে সহযোগিতা করেন একাধিক দোহার। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কণ্ঠের গান পুনরাবৃত্তি করে গেয়ে যান দোহাররা। বাইদ্যার গান পরিবেশন হয়ে থাকে বাড়ির আঙ্গিনায়, উঠানে। পাটি পেতেই আসরমঞ্চ তৈরি করা হয়।

দর্শক ও অভিনয়শিল্পী:

বাইদ্যার গানের দর্শক অধিকাংশই গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। নাট্যপালা পরিবেশনের মুখ্য চালক অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। নাট্যের পাত্রপাত্রী গ্রামের সাধারণ মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

বাইদ্যার গানের মহড়া ও মঞ্চায়নঃ

সাধারণত অবসর সময়টুকুতেই বাইদ্যার গানের রিহার্সালের সময় নির্ধারণ করা হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাস উপযুক্ত সময়। সন্ধ্যার পর যে-কোনো বাড়ির আঙিনায় রিহার্সাল শুরু হয়ে চলে মধ্য রাত পর্যন্ত। কমপক্ষে মাসখানেক রিহার্সাল দেওয়ার পর খোলামঞ্চে মঞ্চায়ন করা হয় বাইদ্যার গান।

একদিল গান

ময়মনসিংহ অঞ্চলে একদিল গানে বয়াতি গেঞ্জি, শার্ট বা পাঞ্জাবি বা চাদর গায়ে দিয়ে তার দেহের নিম্ন-অর্ধাংশে হাফ প্যান্টের উপরে সাদা শাড়ি বা ধূতিতে কুঁচি দিয়ে ঘাগরার মতো করে পরিধান করে যাতে তা সুরে সুরে নাচের সময় গোলাকৃতি হয়ে ফুলে ওঠে এবং বয়াতি পায়ে নূপুর বাঁধে নৃত্যেরতালে তালে যা বাজে। সহশিল্পী, সাইর বা পাইলদের সাথে বয়াতির সংলাপ বিনিময়, কাহিনি বর্ণনা এবং নাচ ও গানের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয় একদিল গান।

বাদ্যযন্ত্রীগণ বিভিন্ন তালে ঢোল, খমক, বাঁশি, মন্দিরা বাজায়। হাসুল ফকির নামক এক সন্তানহীন ব্যক্তির কাহিনি এবং একদিল নামক একজন সাধক পীরের মহিমা বর্ণনার কারণেই সম্ভবত এর নাম হয়ে গেছে একদিল গান। ময়মনসিংহ অঞ্চলের একদিল গানে কাহিনি বর্ণনায় এবং সংগীতের কথায় প্রচুর হাস্যরস, করুণরস এবং কিছুটা শৃঙ্গার রসের প্রকাশ উপস্থিতি শত শত দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধ করে।

বিষহরির পাঁচালি

বিষহরি পাঁচালি ময়মনসিংহ অঞ্চলে একনো বেশ জনপ্রিয় লোকসংগীত। বিষহরির পাঁচালি পাঠ করার আগে মনসা দেবীর পূজার কিছু নিয়ম কানুন মেনে পাঠ শুরু করতে হয়। আবার প্রতিদিন নিয়ম মেনে পাঠ শেষ করতে হয়। যে জায়গায় বসে মনসা দেবীর পূজা এবং পুঁথি সুর করে পড়ার আয়োজন করা হয়, সেই জায়গার পাশেই আঁকা হয় আলপনা। কারণ দ্বিজবংশী দাসের পুঁথির মধ্যে আলপনার কথা আছে। উল্লেখ আছে, সনকা মনসা দেবীর পূজা দিতো। দ্বিজবংশী দাস তার বইয়ে লিখেছেন -

"ছায়া মণ্ডপ করি পাতে ঘাঁসন
পঞ্চবন গুঁড়ি দিয়া বিচিত্র আলপনা ॥"[৫১]

ধারণা করা হয় আলপনা হলো মঙ্গলের প্রতীক এবং এর মধ্যে শুভকামনার ব্যাপার আছে। গ্রামের সাধারণ নারীরাই এই আলপনার কাজ করে থাকে। আলপনায় থাকে পদ্মফুল, পদ্মপাতা। মনসা পূজার মাঙ্গলিক উপকরণ হিসেবে রাখা হয় পান-সুপারি, মঙ্গলবাতি, আমপল্লবের জলঘট এইসব। পূজার পর পরই শুরু হয় আসল বন্দনা। তবে বন্দনায় অর্থাৎ বিষহরি পাঁচালিতে 'স্বরসতী' মা'কে আসরে আহ্বান করা হয়। যেমন-

"মাগো সরসতীর চরণ শিরে করি ধারণ
কৃপা করে আসো মাগো এই আসরে ॥
পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
একদিগে উদয় গো ভানু চৌদিগে পসর ॥"[৫২]

বন্দনার পরে বিষহরি পাঁচালি সুর করে গাওয়া শুরু হয়। মহামায়ার বন্দনা, মনসার বন্দনা, তারপরে পদ্মার জীবনবৃত্তান্ত, লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার জন্মবৃত্তান্ত, লক্ষ্মীন্দরের বিয়ে, লক্ষ্মীন্দরের বিয়ের মধ্যে স্ত্রীর আচার অনুষ্ঠান, লোহার বাসর ঘরে লক্ষ্মীন্দর কে সাপের দংশন, লক্ষ্মিন্দরের বেহুলার ভেলায় করে দেবপুরে গমন, পদ্ম যে লক্ষ্মীন্দরকে ভাল করে এই সব কাহিনী একমাস ধরে সুর করে গাওয়া হয়ে থাকে। তবে বিষহরির পাঁচালির কোন কোন সুরে জারির আহাজারির সুর রয়েছে। কারণ শোকের মাতম জারির সুর ছাড়া জমে না। তাই বিষয়বস্তু বিবেচনায় কোন কোন সময় বিষহরির পাঁচালিতে আহাজারির সুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ৩০৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, পুস্তক বিপণি,প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৫
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১১. ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, মৈমনসিংহ-গীতিকা, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৩, পৃ. ১৮০

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

১৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, *পুস্তক বিপণি*,প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ১০৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

১৬. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ৩৯৫

১৭. ফরিদ আহমদ দুলাল, *বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসংস্কৃতির সন্ধান*, আবিষ্কার প্রকাশনী, পৃ. ৮২

১৮. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ৩৪৭

১৯. ড. আনোয়ারুল করীম, *বাউল সাহিত্য ও বাউল গান*, পরিজাত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ. ১৪১

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

২৪. গোলাম এরশাদুর রহমান, *নেত্রকোণার বাউল গীতি*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃ. ৩৫

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত: ভাটিয়ালি গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ০৩

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৩৯. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ১৭০

৪০. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ১৪৬

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৪৩. ফরিদ আহমদ দুলাল, *বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসংস্কৃতির সন্ধান*, আবিষ্কার প্রকাশনী, পৃ. ৬৩

৪৪. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, বই পত্র, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ১১৮

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৫০. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ৩৭৮

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬

চতুর্থ অধ্যায়

ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে আঞ্চলিক ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহার

ভাষা হলো আমাদের সামাজিক সম্পদ। সমাজক্ষেত্রে, সমাজ-পরিবেশেই ভাষার জন্ম এবং স্থিতি। তবে এ কথা স্বীকৃত যে মাগধী-গৌড়ীয় প্রাকৃতের শেষ অবস্থা অপভ্রংশের কোল থেকে জন্ম নিয়েছে বাংলা ভাষা। মানুষে মানুষে ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমরূপে ব্যবহারেই ভাষার সফলতা, সার্থকতা এবং অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

নৃতত্ত্ব অনুযায়ী মানব সমাজ আর্য, অষ্ট্রিক, মঙ্গোল, দ্রাবিড়, নিগ্রো ইত্যাদি কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত। স্বাভাবিক ভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি আর্য-অষ্ট্রিক-মঙ্গোল-নিগ্রো প্রভৃতি গোষ্ঠীর সমাজ স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছিল এবং সেসব গোষ্ঠীভিত্তিক ভাষা-গোষ্ঠীরও সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে জীবিকার সন্ধানে মানুষের যাযাবর বৃত্তি ও পরস্পর মিলনের মাধ্যমে শুধু রক্তের দিক থেকেই সংকর মানুষের সৃষ্টি হয়নি, সংকর ভাষারও সৃষ্টি হয়েছে।

মূলত রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক সূত্রে বহিরাগত বহু জাতি, উপজাতি, গোষ্ঠী গোত্রের মানুষ এসে বাংলা মুল্লুকের রক্তকে বিচিত্র করে তুলেছে। তার বহু পরিচয় অধুনাতন বঙ্গবাসীর দেহ সংগঠনে, গাত্রবর্ণে, কেশদামে প্রত্যক্ষ করা যায়। নৃতাত্ত্বিক বিচারে বলা যায়, বাংলার ভাষাজগতেও একই ধরণের সংকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ পরিবেশে বিচিত্র উত্তরাধিকার, সংস্কার, বিশ্বাস, রুচি, জীবিকা এবং জলবায়ুর প্রভাব বাংলা ভাষাকেও বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে।

সমগ্রভাবে বাংলা ভাষা ভৌগোলিক মানচিত্রে অনেকখানি জায়গা দখল করে রয়েছে। উত্তরে নেপাল, ডুয়ার্স এলাকা, হিমালয় পর্বতমালার নিম্নাঞ্চল, গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পূর্বে নাগাল্যান্ড-মনিপুর-ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে বিহার ও ওড়িষ্যা এই বিশাল বিস্তৃত পটভূমি জুড়ে বাংলা ভাষার সংসার। এর যে কোন এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্তের দূরত্ব তিন-চার-পাঁচশ মাইল। মাঝখানে রয়েছে বহুসংখ্যক নদ-নদী, বিল-হাওর, বন-জংগল, পাহাড়-টিলা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বাঁধা। এসব অগ্রাহ্য করে যাতায়াত এবং পরিবহন-ব্যবস্থা যথেষ্ঠ উন্নত হলেও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের জনগনের পক্ষে পাঁচ

Dhaka University Institutional Repository

শতাধিক মাইলের ব্যবধানে নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী এলাকা কতিপয় ঘনিষ্ঠ মহলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রধান বিভাগরেখার কাজ করেছে পদ্মানদী। পদ্মার এপার ওপার পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ নামে দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত। সেন রাজাদের আমল থেকেই ওপারের বঙ্গদেশ তথা গৌড়বঙ্গ বা পশ্চিম বঙ্গের সাথে পূর্ব বঙ্গের উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র্য রয়ে গেছে। জীবিকা ও সমাজ বিষয়ে প্রত্যেকটি ঘনিষ্ঠ পরিচিত মহলের অধিবাসীগণ দীর্ঘদিনের পারস্পরিক কথাবার্তায় ভাষার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। এ স্বতন্ত্র্য ঘটে বিকার, পরিবর্তন, বিলোপ কিংবা সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চল এমনি কতিপয় মহলে বিভক্ত হয়েছে। স্বতন্ত্র ভাষা-বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন যাপনে ব্যবহৃত আটপৌরে শিথিল ভাষায়। আঞ্চলিকভাবে গড়ে উঠে বলে একে আঞ্চলিক ভাষা নামে অভিহিত করা হয় যা ভাষাতত্ত্বে উপভাষা হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক ভাষারই একাধিক উপভাষা থাকা স্বাভাবিক। বাংলা ভাষায়ও তার ব্যতিক্রম নেই।

বাংলাদেশে জেলাগুলো উল্লেখযোগ্য আয়তনের প্রশাসনিক একক বলে অনেক ক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক উপভাষা গড়ে উঠেছে। সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ইত্যাদি জেলা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মন্ডলের কতিপয় উল্লেখযোগ্য উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত। মূল ভাষা পরিমন্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষা এলাকা গড়ে ওঠার বিভিন্ন কারণ ও পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। ময়মনসিংহে পৃথক উপভাষা অঞ্চল গড়ে ওঠার কারণ ও পরিবেশ যথেষ্ঠ বাস্তব ভিত্তিক। ময়মনসিংহ শুধু বর্তমান বাংলাদেশের নয়, বৃটিশ আমলের যুক্তবঙ্গের বৃহত্তম এবং সমগ্র ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। এর বিপুল আয়তন ভৌগোলিক অবস্থান, প্রশাসনিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা একটি পৃথক উপভাষা গঠনে সম্পূর্ণ অনুকূল। গারো তুরা ও খাসিয়া পাহাড় দূরতর উত্তরাঞ্চলের সংগে যোগাযোগে বিরাট বাঁধার প্রাচীর, আর রয়েছে ভিন্ন প্রকৃতির ভাষা-এলাকা। সুতরাং এদিক থেকে ভাষাগত অনুপ্রবেশ সীমিত। আসাম থেকে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র ক্রমে যমুনা ও পদ্মা রূপে এ জেলার পশ্চিম প্রান্তের জলপ্রাচীর স্বরূপ। এ কারণে ওপারের পাবনা, ফরিদপুর ও রংপুরের সংগে ময়মনসিংহবাসীর সামাজিক যোগাযোগ কম। দক্ষিণে তেমন প্রাকৃতিক বাঁধা না থাকলেও মধুপুর বনাঞ্চলের বর্ধিত শাখা ভাওয়াল গড়ের যুক্ত হয়ে আবছায়া আড়াল সৃষ্টি করেছে। পূর্বদিকে রয়েছে সোমেশ্বরী, তিতাস, সুরমা, মেঘনা নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং সিলেট-ময়মনসিংহের হাওর এলাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট জেলা বৃটিশ আমলে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে প্রবীণ সিলেটবাসী আজো ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ঢাকা ইত্যাদি পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকস্থ অঞ্চলকে 'বেঙ্গল' নামে অভিহিত করেন। সিলেটের সুনামগঞ্জ, মৌলবী বাজার এবং ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জ মহকুমার হাওরের সংখ্যা বেশী। এগুলো গায়ে গা ঠেকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ফলে জনবিরল এলাকাগুলো ময়মনসিংহের উপভাষা গঠনে অনুকূল ভূমিকা পালন করেছে।

উপরিউক্ত চতুঃসীমার মধ্যে ময়মনসিংহবাসীর মেলামেশা ঘনিষ্ট এবং এই ভৌগোলিক পরিমন্ডেলেই ময়মনসিংহের উপভাষা গড়ে উঠেছে। এর সংগে সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা অঞ্চলের উপভাষার পার্থক্য সুস্পষ্ট। তবে জেলার সীমারেখার সংগে উপভাষা-সীমারেখার কোন সম্পর্ক নেই। যেমন: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ থানার চার থেকে ছয় মাইল পূর্বে সিলেট জেলার ধর্মপাশা থানায় পৌঁছানো মাত্রই আমরা সিলেটী উপভাষামন্ডলে উপস্থিত হব এ কথা ভাবা যাবে না। কারণ প্রশাসনিক সীমারেখা অনুযায়ী ধর্মপাশা থানা সিলেট জেলায় অবস্থিত হলেও সামাজিক প্রয়োজনে ধর্মপাশার যোগাযোগ ময়মনসিংহের সংগে অধিকতর ঘনিষ্ট। আসলে দুটি সন্নিহিত জেলার সীমান্তের উভয় পারের লোক বিয়ে-সাদী, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে হর-হামেশাই পরস্পরের সংগে কথাবার্তা বলে। সুতরাং এক জেলার উপভাষা অন্য জেলার বেশ কিছুদূর অনুপ্রবেশ করে। এ কারণে সিলেট-সন্নিহিত নেত্রকোণা, কুমিল্লা ও ঢাকা সন্নিহিত কিশোরগঞ্জ, রংপুর সন্নিহিত উত্তর জামালপুর এবং পাবনা সন্নিহিত পশ্চিম জামালপুর অঞ্চলে সীমান্ত বহির্বর্তী জেলাগুলোর উপভাষার প্রভাব অল্প-বিস্তর বিরাজমান।

ময়মনসিংহে স্বতন্ত্র পরিভাষা গড়ে ওঠার ব্যাপারে আরো কারণ উল্লেখযোগ্য। যমুনা-ব্রহ্মপুত্র, গারো পাহাড়, হাওর এবং গড়-জঙ্গলের প্রতিরক্ষায় ময়মনসিংহ জেলা পূর্বাপর একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গন্য হয়ে এসেছে। গৌড়বঙ্গে যখন বৈদেশিক আক্রমনের ঝড়-তুফান, তখনো ময়মনসিংহ অনেকটা নিরাপদে সুপ্তিমগ্ন। প্রাকৃত- অপভ্রংশের পোষাক পরিবর্তন করে নব্য আর্য তথা বাংলা ভাষা গড়ে উঠতে এখানে যথেষ্ঠ দেরী হয়েছে। একারণেই ময়মনসিংহের উপভাষায় আজো অনেক অপভ্রংশীয় ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহে ব্যবহৃত উপভাষাও কিন্তু জেলার সর্বত্র এক চেহারার নয়। যেমন: ঢেকি (ডেহি) অবশ্য সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু তার একটি বিশেষ অংশ কোথাও চূরুণ, কোথাও মুগও, কোথাও উছা, আবার কোনো খানে মুনই নামে পরিচিত। সুতরাং বাংলা ভাষার সংগে ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপভাষার সম্পর্ক-পার্থক্য এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে এ আঞ্চলিক ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহার নিম্নে আলোচনা করা হলো-

ধ্বনি পরিবর্তন

শব্দমধ্যে ধ্বনির অবস্থান : তিনটি- আদি, মধ্য, অন্ত। এই অবস্থান মূলতঃ ধ্বনি-পরিবেশ নির্মাণ করে। কোনো কোনো ধ্বনি তিন অবস্থানেই ব্যবহৃত হয়। আবার কোনো কোনো ধ্বনি বিশেষতঃ কতিপয় ব্যঞ্জন ধ্বনি সকল অবস্থানে ব্যবহৃত হয় না। স্বরধ্বনি সকল অবস্থানে যথেষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব কম। বাংলায় শব্দারম্ভে /ড/ যথেষ্টই ব্যবহিত হয়। যেমন: ডর, ডাক, ডিম, ডোবা, ডুলি, ডেরা ইত্যাদি। কিন্তু শব্দশেষে এর ব্যবহার নেই বলা চলে। র-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা, ল-ফলা, ন-ফলা ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও ঘ-ফলা, ঢ-ফলা ত্যাদির প্রচলন নেই। অর্থাৎ সকল ব্যঞ্জনের আগে-পরে অপরাপর সকল ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয় না। পরিবেশগত কারণে ধ্বনিসমূহের অনেক পরিবর্তন ঘটে। বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এসব ধ্বনি পরিবর্তনের কিছু কিছু সূত্র নির্ধারণ করা যায়। স্বরধ্বনির উচ্চারণগত স্বাধীনতা যেমন বেশি, পরিবর্তনের প্রবণতাও তত অধিক। ব্যঞ্জনধ্বনির ধ্বনিগত পরিচয় যেমন জটিল-পরিবর্তনের ধারা তত দুরূহ না হলেও একেবারে সরল নয়। নিম্নে ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্বর-ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন ও ব্যবহার তুলেধরা হলো-

স্বরধ্বনি ও অবস্থান ভিত্তিক ব্যবহার ও পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত :

বাংলা ভাষায় যে কয়টি মূল স্বরধ্বনি আছে, তার সবগুলো ময়মনসিংহের উপভাষার ব্যবহৃত হয়। তবে অধুনিক ভাষার সঙ্গে সর্বত্র অভিন্নরূপে এদের দেখা যাবে না, কোথাও কোথাও পরিবর্তন ঘটে। শব্দের আদিস্থিত স্বরধ্বনি প্রায় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। যেমন -

‘অবস্থা > অবস্তা; অভাব > অবাব; আমন > আমুন; ইদুর > ইন্দুর;
উপবাস > উপাস, উবাস; একলা > এল্‌হা; এই কথা > এই কতা ইত্যাদি।’[১]

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কিছু শব্দের আদিস্থিত স্বরধ্বনিও বদলায়-

এখন > অহন। অহন কান্দস্ ক্যা ?

যেমন: ময়মনসিংহ অঞ্চলেন মেয়েলি গানে আদিস্থিত স্বরধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত -

"আগে-দু না কইছ্লা সাধু না করিবা বিয়া

অহন কেরে ভাও অইচ দাঁড়ি-মুছ কামায়া।"[২]

অলস > অইল্স্যা। আইল্স্যারে, কাউয়া খেদা ঃ বাপের ঠাহুর, তুমি খেদাও।

ওজন > উজন। শইলডার উজন পাস্না, না ?

ওল > উল। কাতিকে উল, অঘ্রাণে খলিশার ঝুল।

এত > অত। অত সুলালিতি (সুললিত) গপ্পডা কিয়ের, জিগাই।

ওখানে > ঐখানে, ঐহান, ঐন। ঐহান বইয়া রইসস্ কেরে ?

শব্দ মধ্যে স্বরধ্বনি পরিবর্তন:

'অ > আ = ভাল > বালা; কাল > কালা; সত্য > হাচা।

যেমন: **বালা** থাকতে **হাচা** কতা কইয়া ফালা।

অ > উ = চামচ > চামুচ; দেখন > দেহুন; নামন > নামুন; কোন সময় > কুনসুমু;

কনুই > কুনি; উঠন > উডুন; করণ > করুন।

যেমন: গারিত্তে **নামুনের** সুমু **কুনিত্** বারি খাইছি।

(গাড়ী থেকে নামনের সময় কনুইতে আঘাত খেয়েছি।)

আ > এ = কাঁথা > খেতা; পাঁক > পেক; টাকা > টেহা; বাঁকা > বেহা; দাও > দেও;

নাও > নেও; পানা > পেনা।

যেমন: **পেহে** পাওডা খাইয়াল্ছে।

আ > উ = তামাক > তামুক।

যেমন: **তামুকটা** জবর তলক (কড়া)।

ই > উ = ডালিম > ডালুম।

যেমন: **ভালুমড়া** ফাইট্যা আক্কইরা রইছে।

সেদিনকার > হেদুংকার।

যেমন: **হেদুংকার** কতা মন নাই।

উ > আ = উঁচু > উচা; নীচু > নীচা;

যেমন: **উচা-নীচা** দেইখ্যা আডিছ্ ।

এ > আ = করিতেছি > করতাছি; দেখিবে > দেখ্বা; শুনিতেছি > হুনতাছি;

শুনিবে > হুনবা; লেখিতেছি > লেখতাছি; জানিবে > জানবা;

যাইবে > যাইবা; খাইবে > খাইবা; ফেল > ফালাও; ফেল্ > ফালা

যেমন: **দেখ্বা** পুলাপান যে রৈদ যায়না।

এ > উ = লেখেন > লেহুইন; পড়েন > পড়ুইন; দেখেন > দেহুইন;

খাটেন > খাটুইন; শুনেন > হুনুইন; নাচেন > নাচুইন;

আজকে > আজগুয়া; কালকে > কালহুর।

যেমন: **দেহুইন** পুলার কাণ্ড, খাতাড়া ছিইর‍্যা ফালাইলো।

বুজান **আজগুয়া** জুদি নাও আইয়ে, **কালহুয়া** ত আইবই।

এ > ই = রাতে > রাইতি; আন্দাজে > আন্দাজি।

এ > তা = ধারে > দার; মাঠে > মাড; হাতে > আত; ঘরে > গর

দোকানে > দুহান; পিঠে > পিড; হাটে > আড।

যেমন: আমার **দার** কি চাছ ? আমার আত পয়সা নাই।

ও > উ = কোকিল > কুকিল; গোপন > গুপন; চোর > চুর;

গোপাল > গুপাল; ধোপা > দূবা; কোন্ > কুন্;

আলো > আলু; সোনা > সুনা; গোল > গুল, ফটো > ফটু;

ঘোড়া > গুরা; লোহা > লুয়া।

যেমন: ও **কুকিল** ডাইক্যো না, ডাইক্যো না ঐ কদম ডালে।

চুরের জ্বালায় আর টিহুন যাইতো না দেহি।

ও > ঔ = গোল > গৌল।

যেমন: কিরে, তগর ইস্কুল কয় **গৌলে** আর্ছে ? গৌল খাওয়া = ঠকা।

ও > ই = বানানো > বানানি; শুনানো > শুনানি; ধরানো > দরানি;

দেখানো > দেহানি; পাঠানো > পাডানি; খেদানো > খেদানি।'[৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্বরলোপঃ

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে স্বরলোপ বলে।

'সেই বেলা/ সে বেলা > হেব্‌লা; করিতেছি > করতাছি; শুনিব > হুনবাম; ডাকিবে > ডাকবা।

দেখিবে > দেখবা; খাঁচতে > খাচাত্; মাথাতে > মাতাত্; বাসাতে > বাসাত্;

জায়গাতে > জাগাত্; ঘোড়াতে > গুয়াত্; পোকা > পুক্।'[৪]

যেমন: **দেখবা**, অহন থাইক্যা তুমার কতা হুনবাম।

মাতাত্ আত দিয়া বৈয়া পরলো।

আমি অইলে এক সের গুল্লা **জাগাত্** বৈয়া খাইয়া দিলাম অয়।

স্বরাগমঃ

উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে, শব্দের মধ্যে এবং শব্দের অন্তে যে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে তাকে স্বারাগম বলে।

'এ > আ + আগত স্বর/ ই = যাইবেন > যাইবাইন; দেখিবেন > দেখবাইন।

পাইবেন > পাইবাইন; দেখুন > দেহুইন; শুনেন > হুনুইন।

খেলেন > খেলুইন; নিবেন > নিবাইন; আজকে > আজগুয়া;

কালকে > কালহুয়া।'[৫]

যেমন: রাইত কইর‍্যা আর কই **যাইবাইন** ?

দেহুইন কমে পাইলে আমারড নিবাইন কেরে ?

হুনুইন, **আজগুয়া** থাইক্যা **কালহুয়া** যাইন যে।

অপিনিহিতি :

শব্দ বা পদ মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির অ্যবহিত পরবর্তী /ই/ বা /উ/ কে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটির আগেই উচ্চারণ করে ফেলার রীতিকে বলে অপিনিহিত। অপিনিহিত ব্যবহার ময়মনসিংহ অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। লক্ষ্য করার বিষয় যে অপিনিহিতির ধ্বনি-বিপর্যয়ের প্রক্রিয়াটি ঘটে বেশির ভাগ /ইয়া/ ভাগান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে।

‘চাপিয়া > চাইপ্যা; কাঁপিয়া > কাইপ্যা; চালিয়া > চাইল্যা;

কাশিয়া > কাইশ্যা; ছাঁকিয়া > ছাইক্যা; কাড়িয়া > কাইড়্যা;

ছাটিয়া > ছাইট্যা; খাটিয়া > খাইট্যা; ছাপিয়া > ছাইপা;

ক্রিয়াপদ ছাড়াও অন্য ধরণের শব্দে এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। যেমন ঃ-

পাতিল > পাইত্ল্যা; গাছুয়া > গাউছ্যা; চাপিলা > চাইপ্ল্যা;

হাটুয়া > আট্যুয়া; মাটিয়া > মাইট্যা; হালুয়া > আউল্যা;

নাকুয়া > নাউক্যা; জালিয়া > জাইল্যা; মাছুয়া > মাছ্যুয়া।

আর এক ধরণের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য ময়মনসিংহে বিশেষতঃ নেত্রকোণায় লক্ষ্যনীয়। এ বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ নাম শব্দে প্রযোজ্য। এর ফলে মূল শব্দে ‘ইয়া’-জাত ‘য়া’ যুক্ত হয়। যেমন :

খালেক > খালেইক্যা; স্বপন > স্বপইন্যা; ছোবান > ছোবাইন্যা;

লিটন > লিটইন্যা; আজগর > আজগইর‍্যা; রবি > রইব্যা;

নসু > নছুছুয়া; টুনি > টুইন্যা; আলাল > আলাইল্যা;’[৬]

যেমন: আমারে সহাল্ সহাল্ ঘুমে **থ্যাইকা** **ডাইক্যা** **তুইল্যা** দিছ্।

জাইন্যা **হুইন্যা** মিছাকতাডা কেমনে কই ?

ময়মনসিংহ অঞ্চলে ‘গাইনের গীতে’ অপিনিহিতির ব্যবহার-

“নুন কিনতে গেছলাম আমি, কালিগঞ্জের আড
নুনেন দাম **হুইন্যা** বাবা, **বইয়্যা** পড়লাম মাড
বুদ্ধি কইরা হস্তা চিনি, **লইয়্যা** ফিরলাম ঘরে
পুলাপাইনে লুডি লইয়া আমার পিছে দৌড়ে
চাট্তে চাট্তে চিনির টোপলা, করলো তারা শেষ
অহন আমার শৈল চাড়ে, তাই ছাড়লাম দেশ ॥”[৭]

Dhaka University Institutional Repository

স্বরভক্তিঃ

যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ কিছুটা কঠিন-শব্দারম্ভে ততোধিক। সেজন্য দুই যুক্ত ব্যঞ্জনের মাঝখানে অতিরিক্ত একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলা হয়। এ ধরণের প্রক্রিয়ার নাম স্বরভক্তি। উদাহরণ:

'গ্রাম > গেরাম; গ্রাস > গেরাস; গ্লাস > গেলাস;

ক্রমে >কেরমে ; ক্রমশ > কোমেশে; ঘ্রাণ > গেরাণ ;

তৃষ্ণা > তিরাস; প্রভাত > পরবাত; প্রায় > পরায়;

ইস্ত্রি > ইস্তারী; প্রত্যেক > পরতেক ; মিস্ত্রী > মেস্তরী ;'[৮]

যেমন: **গেলেশটা** পরায়ই আতে থাইক্যা পইরা গেছিল গা।

পরতেক দিনই **কেলাসে** দেরী কইর‍্যা আহস্ কে ?

ময়মনসিংহের আঞ্চলিক গানে (মৈমনসিংহ-গীতিকার 'দেওয়ান-ভাবনা' পালা) স্বরভক্তির উদাহর-

"**পরথমে** লেখ্যাছে পত্রে গো মাধব সুন্দর
দেখ্যাছি সুন্দরী কন্যা ঘরে একেশ্বর
গাঙ্গের পারে হিজল গাছ লো চিড়ল চিড়ল পাতা
জলের ঘাটে যাইও কন্যাগো কনবাম মনের কথা ॥"[৯]

ব্যঞ্জনধ্বনি সমূহের পরিবর্তন ঃ

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর পরিবর্তনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বিদ্যমান। অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি সমূহ সকল অবস্থানেই প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, বিশেষতঃ শব্দারম্ভে এবং শব্দশেষে। একটি বিশেষ ব্যতিক্রম হচ্ছে /ট/। কেননা ময়মনসিংহের উপভাষায় /ট/ শব্দ মধ্যে খুব বেশি বদলায়। অঘোষ-মহাপ্রাণ ধ্বনি সমূহ শব্দারম্ভে কম বদলায়, কিন্তু ঘোষ-মহাপ্রাণ ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে খুব বেশি। কারণ হলো মহাপ্রাণতার ব্যাপারটি কথা বলায় জোর দেওয়ার উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় যথাযথ জোর দিয়ে Volume of air বেশি বার করে উচ্চারণ করা হয়। যেমন: 'ধোপা' কে সর্বদা সকলে 'দুবা' বলেন না, কোন কোন সময় কেউ কেউ 'ধুবা' উচ্চারণও করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দারম্ভে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত থাকে। যেমন: কাকা > কাহা; তামাক্ > তামুক; গোল > গুল; দোকান্ > দুহান; চাকা > চাহা; পানা > পেনা; জিরানো > জিরানি; বন্ধ> বদ্দ; টাকী > টাহি; পাঁক > পেক; ডোবা > ডুবা।

উপরিউক্ত /ক/ /গ/ /চ/ /জ/ /ট/ /ত/ /দ/ /প/ /ব/ ধ্বনিগুলো শব্দ শেষেও বদলায়না। যেমন- পেক্, রগ্, কাচ্, সাজ্, পেট্, পাত্, স্বাদ্, হাপ্ ইত্যাদি।

/ঙ/ এর ব্যবহার শব্দ শেষে প্রায় নেই। কখনো কখনো শব্দারম্ভের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি বদলায় না। যেমন- খাল্, ছেরা, থাল্, ঠেলা, ঠুলি, ঠুঙ্গা, ফুল, ফিতা, ইত্যাদি।

ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ শব্দারম্ভে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বদলায়।

ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ঃ

'ক > হ = কাকা > কাহা; টাকা > টেহা; বাঁকা > বেহা; বুকে > বুহ; পাঁকে > পেহ, ডাকে > ডাহে।'[১০]

যেমন: ব্যঞ্জন ধ্বনি ক > হ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহ অঞ্চলের গাইনের গীতে দেখা যায়। গাইনের গীতে 'পাইল' রড়ই রসিক হয়। তার ভূমিকাও বড় আনন্দদায়ক। সে মাঝে মাঝে এমন মজার কৌতুকময় গান পরিবেশন করে তাতে সকল শ্রোতার মনোরঞ্জন হয়।

"গাইন গেছে উক্কা খাইত, আমি কিছু কই
হিয়ালে যে বড়ই খাইছিল, লবন পাইছিল কই ?
কথার নাই মাথা বেঙ্গে চিড়া খায়।
বাপে বিয়া করবার আগে পুত হওড় বাইত যায়॥
ছাগল পালে পাগলে নিত্যি ছিড়ে দড়ি
হাজার **টেহার** বাগান খাইয়া লেদায় বড়ি বড়ি॥"[১১]

'খ > হ = শাঁখা > শাহা; পাখা > পাহা; মুখে > মুহ; দেখিস্ > দেহিস্; রাখ > রাহ; রাখুন > রাহুইন; মাখ > মাহ; দেখ > দেহ।

Dhaka University Institutional Repository

/ঘ/-সকল অবস্থানেই প্রায় বদলায়। এ পরিবর্তন অল্পপ্রাণতা নানে অভিহিত হতে পারে।

যেমন:- ঘর > গর; ঘাম > গাম; ঘি > গি; ঘোড়া > গুরা; ঘুমানো > গুমানি;
বাঘ > বাগ; মাঘ > মাগ; ঘাস > গাস; মাঘের > মাগের; ঘামাচি > গাম্‌মাছি।

/চ/ ও /ছ/-ময়মনসিংহের উপভাষায় /চ/ এবং /ছ/ এর উচ্চারণ কিছুটা শিস্‌গুণ সম্পন্ন। এ দুটোর শুদ্ধ স্পৃষ্ট উচ্চারণ কম। এটি ময়নসিংহের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের মুখে শোনা যাবে। খুব সচেতন কান না হলে এ বৈশিষ্ট্যটুকু ধরা পড়বে না। /চ/ এর যথার্থ স্পৃষ্ট উচ্চারণ শোনা যাবে 'বাচ্চা', 'গচ্চা' উচ্চারণ প্রভৃতি শব্দে। অনুরূপ ভাবে আচ্ছা, যাচ্ছে-তাই, পিচ্ছিল, যাচ্চি, কিচ্ছা, শব্দে শোনা যাবে /ছ/ এর প্রকৃত উচ্চারণ। এখানকার কাছে, গাছ, পাছে, মাছ, আছে প্রভৃতি শব্দে /ছ/ এর উচ্চারণ শুদ্ধ স্পৃষ্ট নয়, অনেকটা শিসগুণ যুক্ত বলে /স/ এর মত।

/জ/ এর দুটি উচ্চারণই শ্রুতিগোচর হয়। এদের একটি স্পৃষ্ট, অপরটি আংশিক দৃষ্ট বা শিস্‌। লিখিত দৃষ্টান্তে এর পার্থক্য নির্দেশ করা যাবে না।

/ঝ/ তিন অবস্থানে ব্যবহৃত হলেও এর অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হওয়ার প্রবণতা খুব বেশী।

ঝ > জ = ঝি > জি; মাঝে > মাজে; ঝোল > জুল; মাঝি > মাজি;
ঝিঙ্গা > জিঙ্গা; ঝাল> জাল।।
যেমন: **জি** চাহরের নগে কাইজা করবার নাগ্‌ছ কেন ?
মাছের **জুলডা** জাল অনছিল্‌।

ট > ড = আটা > আডা; ইঁটের > ইডের; হাঁটু> আডু; মটি> মাডি, ঝাঁটা > জাডা;
পেটে > পেডে; মোটা > মুডা; খাঁটি > খাডি।

যেমন: **আডা** (আটা) কত সের অনছুইন।
কামলারা ইডের **মাডি** (মাটি) কুবাইতেছে।'[১২]

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহ অঞ্চলে 'বিয়ের গানে' ব্যঞ্জন ধ্বনি ট > ড পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত -

"লাল **মাডি** তুল তুল খালাজীর বিয়া।
সাদ্দিন ধইর‍্যা জামাই আইছে মডুক মাথায় দিয়া ॥
নাস্তা দিলে খায় না বিদায় দিলে যায় না
বে-লাজ **জামাইড্যা** এই রহম কিয়া ॥"[১৩]

'ঠ > ড = আঠা > আডা; পাঁঠা > পাডা; পিঠা > পিডা; পিঠে > পিড
মাঠে > মাডে; কোঠা>কুডা।

যেমন: **মাড** বৈয়াই ত **পিডা** খাওন গেল অয়।
পাডাডা কুডাগর বাইন্দ্যা থৈছ্।

/ড/- শব্দ শেষে এর ব্যবহার নেই। অন্যত্র অপরিবর্তিত।

/ঢ/- শব্দারম্ভে অল্প প্রাণিত হয়। শব্দ শেষে ব্যবহার নেই।

ঢাক > ডাক; ঢোলা > ডুলা; ঢেঁকি > ডেহি;
ঢুকে > ডুহে; ঢোল >ডুল; ঢেঁকুর > ডেহুর।'[১৪]

যেমন: মহুয়া পালায় খেলা প্রদর্শন করার সময় হুমড়া বাইদ্যা উক্তি-

"হুমড়া বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে মাইনকিয়া ওরে ভাই
ধনু কাডি লইয়া চল তামসা করতে যাই।
যখন নাকি হুমড়া বাইদ্যা **ডুলে** মাইলো বাড়ী
নদ্যাপুরের যত মানুষ লাগলো দৌড়াদৌড়ি ॥"[১৫]

থ > ত = মাথা > মাতা; কথা > কতা; কাঁথা > খেতা
নথি > নতি; গাঁথে > গাতে; মাথাল > মাত্‌লা।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে ঘাটু গানে ব্যঞ্জন ধ্বনি থ > ত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত -

"বন্ধু একবার আইসা আমায় দেখাইয়া যাও রে
জ্বালাইছে চান্দের বাত্তি তুমি ছাড়া কাটেনা রাতিরে

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধু একবার আইসা আমায় দেইখা যাওরে ॥

চিঠিতে তো লিখি কত **কতা**

সব **কতা** কি যায়ওরে লেখারে বন্ধু

লণ্ঠনো জ্বালাইয়ারে লিখি

না দেখে যে ননদী শাশুড়ি

পন্থ্ পানে চাইয়াওে থাকি তোমারি আশায় ॥"[১৬]

'ধ > দ = ধনী > দনী; ধান >দান; ধোপা > দুবা;

ধার > দার; সাধু > সাদু; ধুতি > দুতি;

বাঁধা > বাদা; যুদ্ধ > যুদ্দ; সাধলো > হাদলো।'[১৭]

যেমন: সিদা **দুবা** বারিত গিয়া **দুতিডা** দৈবার দিয়া আয়।

প > ফ = পানি > ফানি; পানা > ফেনা; পাস > ফাস।

যেমন: ময়সিংহের জারি গানে বয়াতির উক্তি -

"বারমাস্যা বাইঙ্গন আছিল চউখ্যে দেখলা না

ফাইব্যা (পাবদা) মাছের হিদল (চেপা) থইয়া ছাউল্নে দিলা না ॥"[১৮]

'প > ব = সুপারী > সুবারী; ধোপা > দুবা; কপাটি > কবডি।

ভ > ব = ভাল > বাল; ভগবান > বগবান; ভুল > বুল; ভেড়া > বেরা;

ভালুক > বাল্লুক; ভাই > বাই; ভাগ্নে > বাইগ্না; লাভ > লাব।

/র/ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম জামালপুরের কয়েকটি থানায় /র/ শব্দারম্ভে লোপ পায়।

যেমন- রাইত > আইত। রোজা > ওজা। রঙ্> অঙ্। রক্ত > অজ্ঞ।

/ল/ শব্দের আদিস্থিত /ল/ টাঙ্গাইলে /ন/ তে পরিবর্তিত হয়। যথা-

লাউ > নাউ; লাগে > নাগে; লোহা > নুয়া; লোটা > নুটা; লাল > নাল;

Dhaka University Institutional Repository

লেখা > নেহা; লও > নও; লেপ > নেপ; লাগাম > নাগাম; লাগবে > নাগবো;[১৯]

যেমন: টেহা পঞ্চাশ **নাগে**, ষাইড **নাগে নাগবো** - মোদ্দা **নেপ** একটা **নৈয়া** আউন চাই।

/শ, ষ, স/ বাংলা বর্ণমালায় উষ্মবর্ণ তিনটি, কিন্তু ধ্বনি দুটি-/শ/ ও /স/ । /ষ/ এর কোন পৃথক উচ্চারণ নেই, প্রায় সর্বদাই /শ/ এর মত উচ্চারিত হয়। /শ/ এবং /স/ অবশ্য নিজ নিজ উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলা বানানে লেখা হয় না। ময়মনসিংহের উপভাষায়ও /শ/ এবং /স/ এর উচ্চারণ আছে। তবে শব্দের আদিস্থিত /শ/, /স/ অনেক ক্ষেত্রেই /হ/ তে পরিবর্তিত হয়। যেমন-

'শবরী > হবরী; শালা > হালা; শালিক > হালিক;

শুকনা > হুগনা; শোলা > হুলা; শিয়াল > হিয়াল;

সস্তা > হস্তা; সাপের > হাপের; শুধুশুধু > হুদাহুদি।'[২০]

যেমন: হুদাহুদি **হালিকটা** দরছ্ কেরে ?

হস্থা দেইখ্যা এক আলী হবরী কলা কিনলাম।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিয়ের গানে ব্যঞ্জন ধ্বনি শ , স > হ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত -

"ডুপি লো ডুপি ধান লারছস্ কই ?

চইল্তা গাছের তলে।

বাঘে ডুক্কার মারে,

হাপেও লেঙ্গুর লারে।"[২১]

'/হ/ শরাম্ভের /হ/ অনেক ক্ষেত্রে লোপ পায়। যেমন:

হাতি > আত্তি; হাত > আত; হিসাব > ইসাব;

হাঁটু > আড়ু; হেলেঞ্চা > এলেঞ্চা; হনুমান >অনুমান;

হালি > আলি; হাঁস > আস; হাতা > আতা।

Dhaka University Institutional Repository

/ড়/ এই ধ্বনিটি প্রায়শই /র/ রূপে উচ্চারিত হয়। যথা-

বড় > বর;	ভেড়া > বেরা;	বাড়ী > বারি;
কাপড় > কাপর;	পড়ে > পরে;	পাড়া > পারা;
ঝড়ু > জারু;	মাড় > মার;	হাড় > হার।'[২২]

বাংলা লোসংগীতে আঞ্চলিকতা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মূলত ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করেই অঞ্চলিকতা সৃষ্টি হয়। আঞ্চলিক ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহারের কারনেই লোকসংগীতে অঞ্চলভিত্তিক স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে। যার ফলে লোসংগীতে আঞ্চলিকতা সহজেই অনুমেয়। আঞ্চলিকতা বিবেচনায় লোকসংগীত উচ্চারণে বিশিষ্ট ঢং বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা প্রকাশ পায় লোকসংগীত গায়কীর মাধ্যমে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে আঞ্চলিক ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহার সে অঞ্চলকে একটি স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। উপরিউক্ত বিস্তারিত বর্ণনা এবং উদাহরণের পাশাপাশি ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রচলিত কয়েকটি পর্যায়ের লোকসংগীত নির্বাচন করে উক্ত লোকসংগীতের আঞ্চলিক ভাষা এবং ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ছক আকারে তুলেধরা হলো-

(০১)

"পাখা **বানাইয়্যা** দেরে বিধি **উইড়া যাইতাম** রে সুরেশ্বর
পাখা বানাইয়া দেরে বিধি উইড়া যাইতাম বন্ধুয়ার তালাসে।
পাখা যুদি দিত বিধি আমারে
উইড়া **যাইয়া** করতাম দেখা বন্ধুয়ার সনে।
বিধি যুদি দিতরে পাখা উইড়া যাইয়া করতাম দেখা।
আগে যাইয়া কাছে বইসা **জিগাইতাম**
আমার বন্ধু কেমন আছেরে দয়াল।
পাখা বানাইয়া দেরে বিধি উইড়া যাইতাম বন্ধুয়ার তালাসে
পন্থে **চাইয়া** থাকি বন্ধু নি আসে
পাখা বানাইয়া দেরে বিধি উইড়া যাইতাম দূরত
উইড়া যাইতাম সুরেশ্বর।"[২৩]

[মাজারের গান]

Dhaka University Institutional Repository

মাজারের গানে অঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার-

সাধারণ বাংলা	ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা	ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য
বানিয়ে	বানাইয়্যা	অপিনিহিতি
উড়া	উইড়া	অপিনিহিতি
যেতাম	যাইতাম	স্বরাগম
জিজ্ঞাসা করতাম	জিগাইতাম	স্বরাগম
চেয়ে	চাইয়া	অপিনিহিতি

(০২)

"ওরে ও ভিনদেশি **নাইয়া**

দুপুর বেলায় কোন সাহসে

চলছ তরী **বাইয়া** ॥

এ যে নদী নয় কামনা সাগর

পাকে পাকে উঠছে লহর

দিন রজনী **বইতেছে** ঝড়

দেখিস না কি **চাইয়া** ॥

জোয়ার এলে খুব হুঁশিয়ার

ছাড়লে তরী উপায় নাই আর

(কত) রঙ্গের ডিঙ্গা হলো চুরমার

তরঙ্গে পড়িয়া ॥

পরাণে যদি শান্তি চাও

উজান যাবে বাদাম চড়াও

(দীন) উপেন্দ্র কয় হালটি ঘুরাও

শ্রীগুরুর নাম **লইয়া** ॥"[২৪]

[ভাটিয়ালি গান]

ভাটিয়ালি গানে অঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার-

সাধারণ বাংলা	ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা	ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য
নেয়ে	নাইয়া	অপিনিহিতি
বাওয়া	বাইয়া	অপিনিহিতি
বইছে	বইতেছে	স্বরাগম
চেয়ে	চাইয়া	অপিনিহিতি
লয়ে	লইয়া	অপিনিহিতি

(০৩)

"আমি পাপী মুখে গাইব কি তবু তো তোমারে ডাকি

ডাকতে ডাকতে আল্লাহ আমার হয় যেন মরণ।

প্রথমে বন্দনা করি আল্লা নিরঞ্জন

দ্বিতীয় বন্দনা করি নবীজির চরণ

তারপর বন্দনা করি মা ফাতেমার চরণে

যে মায়া পার করবে একদিন পুলসেরাতের পুল।

পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর

একদিক উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর

উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত

যেখানে **সাজাইলেন** আল্লা মৌলামের পাথর।

হাত **উঠাইয়্যা** মারে পাথর বুক পাতিয়া লয়

বুকেতে পাতিয়া পাথর খণ্ড চারি হয়।

পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা পাকস্থান

যেখানে ছাপাইলেন আল্লা হাদিস আর কোরান

আমি আর কাকে ডাকিব গো মা কালে বলে।

তার পশ্চিমে বন্দনা করি মদিনার শহর

নবীর বংশ হইল ধ্বংস এজিদের কারণ

দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর

যে দইর‍্যা বায়া **যাইত** চান্দ সদাগর ----।"[২৫]

[গাজির গান]

গাজির গানে অঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার-

সাধারণ বাংলা	ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা	ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য
সাজালেন	সাজাইলেন	অপিনিহিতি
উঠিয়ে	উঠাইয়্যা	অপিনিহিতি
যেত	যাইত	স্বরাগম

(০৪)

"নদীয়ার **বেফারি** (বেপারি) গো হয়ে বেড়াই রাই তোমার মন্দিরে

হায়রে বড় আশা **কইরা** গো মনে

আইলাম রাই তোর কুঞ্জের গো দ্বারে

হে পাইলামনা না তোরে

বড় আশা কইরা গো মনে মনে

আইলাম রাই তোর কুঞ্জের গো দ্বারে

ওরে অভাগিনীর **কফাট** (কপাট) **বন্দ** (বন্ধ)

অসাদিতের পর্দা হায়ালাতে

হেই নদীয়ার বেফারি হয়ে বেড়াই রাই তোর মন্দিরে ॥"[২৬]

[ঘাটু গান]

ঘাটু গানে অঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার-

সাধারণ বাংলা	ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা	ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য
বেপারি	বেফারি	ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন প > ফ
করে	কইরা	অপিনিহিতি
কপাট	কফাট	ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন প > ফ
বন্ধ	বন্দ	ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন ধ > দ

Dhaka University Institutional Repository

(০৫)

মহররমের চাঁদ বন্দনা

হায়রে মহররমের চাঁদ তুমি দেখা দিয়ো না গো
তুমি **দেহা** দিলে মায়ের আঁখির পানি রবে না ॥
আঁখি কালো, পাখি কালো, কালো ফুলের ভ্রমরা
পুত্রশোকে মায়ের কলিজা **পুরে** হলো আঙ্গারা ॥
হাসান মরল বিষ **খাইয়া**, হোসেন শহীদ কারবালায়
জয়নাল আবদীন বন্দী **হইলো,** এজীদেরি জেলখানায় ॥

[জারি গান, শ্রুতঃ হেলিম ময়াতি, তারিখঃ ১-৩ নভেম্বর ২০১৬]

জারি গানে অঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার-

সাধারণ বাংলা	**ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা**	**ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য**
দেখা	দেহা	ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন খ > হ
পুড়ে	পুরে	ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন ড় > র
খেয়ে	খাইয়া	অপিনিহিতি
হলো	হইলো	স্বরাগম

(০৬)

"সোনাই: শোন শোন দেওয়ান ভাবনা

শোন আমার মাথার **কিরা**

স্বামীরে **রাইখ্যাছ** তুমি ঘরে বন্দী **কইরা**

পরাণের বন্ধুয়া আগে করিবা খালাস

তবে যে **মিটাইব্যাম** আমি তোমার মনের **আস**

আমি যে **আইসি** গো দেওয়ান

এই না তোমার পুরে

এই কথা না **জানাইও** মোর পরাণ বন্ধুরে ॥

ভাবনা: তোমার **লাইগ্যা** কন্যা আমি কোন কাম না পারি

মাধবের মুক্তি দিতে **যাইবাম** তরা করি।"[২৭]

পালাগান (গীতিকা) এ অঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার-

সাধারণ বাংলা	ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা	ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য
কিড়া	কিরা	ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন ড় > র
রেখেছ	রাইখ্যাছ	অপিনিহিতি
করা	কইরা	অপিনিহিতি
মিটাবাম	মিটাইব্যাম	অপিনিহিতি
আশ	আস	ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন শ > স
আসা	আইসি	স্বরাগম
জানিও	জানাইও	স্বরাগম
লাগা	লাইগ্যা	অপিনিহিতি
যাব	যাইবাম	অপিনিহিতি

(মৈমনসিংহ গীতিকা, দেওয়ান-ভাবনা)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, *ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৮। পৃ. ৩৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৭. শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : ময়মনসিংহ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩। পৃ. ১৪৯

৮. জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, *ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৮। পৃ. ৪০

৯. ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, গতিধারা , প্রথম প্রকাশ ১৯২৩। পৃ. ১৮১

১০. জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, *ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৮। পৃ. ৪১

১১. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, বই পত্র, প্রথম প্রকাশ ২০০৪। পৃ. ৯১

১২. জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, *ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৮। পৃ. ৪২

১৩. জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, *ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৮। পৃ. ১৭৮

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১৫. ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, গতিধারা , প্রথম প্রকাশ ১৯২৩। পৃ. ৭

১৬. ফরিদ আহমদ দুলাল, *বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসংস্কৃতির সন্ধান*, আবিষ্কার প্রকাশনী। পৃ. ৬৯।

১৭. জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, *ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৮। পৃ. ৪৩

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

২৩. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (ময়মনসিংহ)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ১৪৩

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

২৭. ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৩, পৃ. ১৯২

উপসংহার

ময়মনসিংহ অঞ্চলের দৈন্যহীন পল্লীবাসীর লোকসংগীতে সুপ্রচুর অবসর নিস্ফল ও নিরর্থক আনন্দ-বিলাসে বিনোদিত হয় নি। বন্ধুর মতো আপন সুবিশাল আকাশের নীচে সৌন্দর্যের দীপ্তিতে সমুজ্জল যে সত্য, হৃদয়াকাশে রংধনুর সপ্তরাগে রঞ্জিত সেই সত্যই স্পন্দিত ও প্রমূর্ত হয়েছে তাঁদের ছন্দবৈচিত্র্যে, ঝংকৃত হয়েছে সুকণ্ঠের সুর-রাগিনীতে। কতো গান, কতো কথ-কতা, জীবন বৃত্তে উপলব্ধ অনুভূতির কতো চিত্ত, কতো স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁরা, আজ সেই জানা-অজানা মাটির মতো খাঁটি ময়মনসিংহ জেলার অগণিত কবির রচিত লোকসংগীতের বর্ণচ্ছটায় মুগ্ধ আমাদের চিত্ত। পল্লীর ঘরে ঘরে নর-নারীর মুখে মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছিল এ বিশাল লোবসংগীত জগত।

'ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়, বৈশিষ্ট্য এবং সুরবৈচিত্র্য' বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পরিশেষে এ কথা প্রতীয়মান যে, ময়মনসিংহ জেলা লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব ভান্ডার। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ জেলা সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্ব স্থানীয়। চন্দ্রকুমার দের সংগ্রহে এবং ডক্টর দীনেস চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হলে ময়মনসিংহ ঋদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতি অঞ্চল হিসেবে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীত ভান্ডারের যে প্রাচুর্য তা বাংলাদেশের অন্যকোন অঞ্চলে নেই। কারণ ময়মনসিংহ অঞ্চলের যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ তা লোকসংগীত সৃষ্টিতে সহায়ক। ফলে পল্লী গ্রামের নির্জন পরিবেশে, প্রকৃতিক নিবিড় স্নেহে পল্লীকবিরা রচনা করেছেন জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ঘাটু, পালা, বাউল এবং গাজীর গানের মতো সমৃদ্ধ লোকসংগীত।

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, নামকরণ, জনবসতির পরিচয় সহ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং প্রচলিত লোকসংগীতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পরবর্তী আলোচনায় ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রধান ধারার লোকসংগীতগুলো আধেয় বিশ্লেষণ করে আলাদাভাবে প্রতিটি লোকসংগীতের বিষয়বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে ব্যবহৃত সুর ও তালের বিশ্লেষণসহ স্বরলিপি উল্লেখ করে অত্র অঞ্চলের লোকসংগীতের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য তুলেধরা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। সর্বশেষে ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা, বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহার ও ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে উদাহরণসহ তুলে ধরা হয়েছে।

'ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতের বিষয়, বৈশিষ্ট্য এবং সুরবৈচিত্র্য' নিয়ে গবেষিত বিষয়টিতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীত পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত ফলাফল স্বরূপ একটি বিষয় প্রতীয়মান যে, এ অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীতের বিষয় এবং সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য অধ্যায় ভিত্তিক আলাদাভাবে তুলে ধরার ফলে কোন্ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভাটিয়ালি, জারি, সারি, ঘাটু ইত্যাদি গান করা হয়, গায়কীর ধরণ, গানের বিষয়বস্তু, কিভাবে গাওয়া হয় তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। যেমন: মৈমনসিংহ গীতিকার উপজীব্য বিষয় হলো প্রেম-বিরহের স্বাভাবিক প্রচ্ছায়ায় বিয়োগান্তক আবহ সৃষ্টি করা। বাউল গানে গ্রামীণ নিরক্ষর চাষা মজুর জনগোষ্ঠী মানব প্রেমের যে ভুবন গড়ে তোলেন, সে ভুবনে সুরের ঝংকার সৃষ্টিতে মানব প্রেম ও প্রকৃতি প্রেমের চেতনাকে গতিশীল করার যে প্রয়াস পায় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় ভাটিয়ালি, জারি, মেয়েলী গীতের মতো কতিপয় গানের তাল বিশ্লেষণ সহ স্বরলিপি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছ। ফলে পরবর্তী সময়ে এ স্বরলিপিগুলো অত্র অঞ্চলের লোকসংগীতের সুর সম্পর্কে ধারণার সাহায়ক উৎসব হবে বলে আমি বিশ্বস করি।

লোকসংগীতের কথা বা বাণীর ভাষা সর্বদাই আঞ্চলিক উপভাষা। স্থানীয় কথোপকথনের পরিবেষ্টনে এক এক ধরনের লোকসংগীত পরিবৃদ্ধি লাভ করেছে। গবেষণার আরো একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হলো ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহার পদ্ধতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীতে কিভাবে এই উপভাষা স্থান করে নিয়েছে এবং ব্যবহার হচ্ছে তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন গানের উদাহরণসহ তুলেধরা হয়েছে।

পরিশেষে এ কথা বলা যায়, ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকসংগীত বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য এবং বিচিত্রতার এক উজ্জ্বল সম্ভার। এই গবেষণা চলাকালীন সময়ে নানা সীমাবদ্ধতায় এ গবেষণা কর্মে তথ্য ঘাটতি এড়ানো যায় নি। তবে সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে গবেষণা কর্মটিকে যথার্থ পরিপূর্ণতা দানের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি এ গবেষণাকর্মটিতে যে বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে তা বাংলা লোকসংগীতধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের তথ্য প্রদানে সহায়ক উৎস হবে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

- আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড)*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৪।
- আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড)*, গতিধারা , প্রথম প্রকাশ ২০০৮।
- আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড)*, গতিধারা , প্রথম প্রকাশ ২০০৮।
- আবুল আহসান চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতি -বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭।
- আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া। প্রথম প্রকাশ ২০০৫।
- আশিস ঘোষ, *মৈমনসিংহ ও প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩।
- আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি, একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায় (১ম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৭।
- আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি, একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায় (২য় ও ৩য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।
- আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেমচেতনা*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০১।
- আলী ইদ্রিস, *মুক্তাগাছার অন্ত্যজ শ্রেণীর ভাষা*, আদিয়াবাদ সাহিত্য ভবন ও ভাষাতত্ত্ব কেন্দ্র।
- আবদুল খালেক, *মৈমনসিংহ গীতিকা, জীবন ও শিল্প*, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, প্রথম প্রকাশ ২০০৩।
- আবদুর রশীদ গাউসুর রহমান, *ময়মনসিংহের ইতিহাস ঐতিহ্য*, টুম্পা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৩।
- আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, গতিধারা , প্রথম প্রকাশ ১৯২৩।
- আনোয়ারুল করীম, *বাউল সাহিত্য ও বাউল গান*, পারিজাত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।
- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা।
- এমদাদ খান, *নেত্রকোণার লোকসাহিত্য ভান্ডার ও মৈমনসিংহ গীতিকা*, পলল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১৩।

Dhaka University Institutional Repository

- ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত: ভাটিয়ালি গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭।
- ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত*, সারিগান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮।
- ওয়াকিল আহমদ, *বাউল গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০০।
- করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫।
- করুণাময় গোস্বামী, *বাংলাগানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩।
- গোলাম এরশাদুর রহমান, *নেত্রকোণার বাউল গীতি*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪।
- জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ, *ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, *জেলা বোর্ড: ময়মনসিংহ*, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৮।
- ফরিদ আহমদ দুলাল, *বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসংস্কৃতির সন্ধান*, আবিষ্কার প্রকাশনী।
- বরুণকুমার চক্রবর্তী, *গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩।
- ম ন মুস্তফা, *আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১।
- মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *সংগীত সংলাপ*, প্রতীক, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।
- মোবারক হোসেন খান, *সংগীত দর্পণ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।
- মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮।
- মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *লোকসংগীত*, প্যাপিরাস।
- মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ ২০০৫।
- মো. আবদুল করিম মিঞা, *টাঙ্গাইলের লোকসংগীত*, প্রথম প্রকাশ ২০০১।
- ময়মনসিংহ জেলা দ্বিশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, *ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা*, *জেলা প্রশাসন ময়মনসিংহ*, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮।
- মাহবুবুল আলম, *ময়মনসিংহ গীতিকা*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।
- মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বই পত্র, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

- ম. হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের লোকসংগীত ভৌগোলিক পরিবেশ*, বিজয় প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।
- মোঃ শহীদুর রহমান, *ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮।
- রহমান হাবিব, *বাংলাগানের ভাবসম্পদ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৯।
- রওশন ইজদানী, *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭।
- শাহাদাৎ হোসনে নিপু, *ময়মনসিংহ গীতিকা: সমাজচিত্র ও শিল্পরূপ।*
- শাহিদা খাতুন সম্পাদিত, *লোকউৎসবে ঐতিহ্যচেতনা*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮।
- শামসুজ্জামান খান ও ড. মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলন : ৫৩*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২।
- শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : ময়মনসিংহ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩।
- শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : নেত্রকোণা*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩।
- শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৪।
- শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকসংগীত সমীক্ষা, কেন্দুয়া অঞ্চল*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩।
- সৈয়দ আজিজুল হক, *ময়মনসিংহের গীতিকা, জীবন ধর্ম ও কাব্যমূল*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০।